শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
জীবনী ও কথামৃত

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৬৪
আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্যসেন স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯

ভূমিকা

পুণ্যভূমি এই ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগে যুগে দেশের ধর্মের ক্ষেত্রে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে এক একটি যুগ প্রয়োজনসিদ্ধ করে গেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ছিলেন এমনই এক মহাপুরুষ যিনি ধর্মের সঙ্গে কর্মকে সমন্বিত করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে ধর্মের সত্যকে রূপায়িত করে তোলার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দেন। এদিক দিয়ে ঠাকুর নিঃসন্দেহে এক বিশেষ যুগ প্রয়োজন সিদ্ধ করে যান এবং মানুষের বহু আত্মিক সমস্যার সমাধান করে যান।

ঠাকুরের এই জীবনী গ্রন্থটি আয়তনে বৃহৎ না হলেও ঠাকুরের জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে সুচারুরূপে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির একটি বিশেষত্ব হল এই যে, ঠাকুরের যে সব ভক্তগণ বিপদকালে ঠাকুরকে স্মরণ করে অলৌকিক ভাবে উদ্ধার লাভ করেন, তাঁদের নিজস্ব জবানবন্দীতে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাগুলি যথাযথভাবে বিবৃত করা হয়েছে। গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষত্ব হল ঠাকুরের অসংখ্য বাণী ও কথামৃতগুলির সংযোজন।

আমাদের মনে হয় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর অমর কীর্তি, বাণী ও আদর্শের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন এবং ভূমিখণ্ড ও কালখণ্ডকে অতিক্রম করে দেশের ধর্ম জগতে চিরস্থায়ী এক অম্লান ও অক্ষুণ্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

আমাদের প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি যদি ঠাকুরের ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে পাঠকগণ পড়ে উপকৃত হন, তাহলে আমাদের সকল প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

সে আজ একশ পনের বছর আগের কথা।

সেকালে পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলায় পদ্মানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হিমাইতপুর গ্রাম, এক বড় রকমের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। কথিত আছে আকবরের আমলে তাঁর সেনাপতি হিম্মৎ খাঁ একবার এই গ্রামের কাছে এক ছাউনি বা সামরিক শিবির স্থাপন করেন। সেই হিম্মৎ খাঁর নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম হয় হিমাইতপুর। আবার অনেকে বলেন, রাজা মানসিংহের পুত্র হিম্মৎ সিং-এর নাম অনুসারে এই নামকরণ হয় হিমাইতপুর।

সে যাই হোক, সারা অঞ্চলের মধ্যে এই হিমাইতপুর গ্রামের চৌধুরী পরিবারের এক বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই পরিবারের গৃহকর্তা ও গ্রামের জমিদার রামেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ও এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের তালনবমী তিথি। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা আঠাশ মিনিটে রামেন্দ্রনারায়ণের কন্যা মনোমোহিনীদেবী দীর্ঘ এগার মাস গর্ভধারণের পর এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। দেবশিশুর মতো এই শিশুর সুন্দর দেহাবয়ব ও উজ্জ্বল কান্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় প্রতিবেশীরা সকলে। সুন্দর সুঠাম দেহভঙ্গিমা, গৌর বর্ণ, ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল কিন্তু কেশহীন মাথাটি দেখে মনে হলো যেন মুণ্ডিত মস্তক। এমন মুণ্ডিত মস্তক অবস্থায় কোন শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে আগে কেউ কোথাও কখনো দেখেনি। আবার পুরো এগারমাস গর্ভধারণের পর কোন নারীকে সন্তান প্রসব করতেও কেউ কোথাও দেখেনি বা শোনেনি।

অতি বিলম্বিত প্রসব কালেরও কথা বিবেচনা করে এবং শিশুর দেবপম চেহারা দেখে পাড়ার ও গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এ শিশু সাধারণ শিশু নয়, এ শিশু নিশ্চয় কোন দেবাংশী পুরুষ যে অসাধারণত্বের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে, ভবিষ্যতে সে এক মহাপুরুষ রূপে দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করে পিতৃকুল ও মাতৃকুল সহ সারাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

মনোমোহিনীদেবীর মাতা কৃষ্ণসুন্দরী কন্যার গর্ভধারণের কাল অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন তাই শিশুর দেবতুল্য রূপ দেখে অপার আনন্দ লাভ করলেন। পিতা রামেন্দ্রনারায়ণও বিনা কষ্টে কন্যার পুত্রসন্তান প্রসবের কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তাঁরও আনন্দের সীমা রইল না।

এমন সময় চৌধুরী পরিবারের সকলেরই একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে কথা হল কিছুদিন আগে মনোমোহিনীদেবীর শ্বশুরবাড়িতে মধ্যাহ্নকালে দীর্ঘকায় জটাজুটধারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসী এসে স্বামী শিবচন্দ্রের অতিথি হন। সন্ন্যাসী এসেই পরিবারের

বালিকা বধূ মনোমোহিনীদেবীর হস্তে সেবা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অতিথি-বৎসলা মনোমোহিনীদেবী আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতে রান্না করে সন্ন্যাসীকে সযত্নে ভোজন করালেন। তাঁর সেবা যত্নে তুষ্ট হয়ে সন্ন্যাসী বিদায়কালে এক আশ্চর্য ভবিষ্যৎ বাণী করে গেলেন। তিনি বললেন, কিছুদিনের মধ্যে এই পরিবারের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হবে এবং এমন এক শক্তিমান পুরুষের জন্ম হবে যিনি আপন চরিত্র ও মহিমাবলে অসংখ্য মানুষের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এই পরিবারের একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণীর একটি অংশ সত্য প্রমাণিত হয়। তাই মনোমোহিনীদেবীর শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির সকলে সদ্যজাত এই শিশুকে দেখে ভাবতে লাগলেন, সন্ন্যাসীর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর একটি অংশ যখন সত্য হয়েছে, তখন আরেকটি অংশও অবশ্যই সত্য হবে। এই শিশু ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এক মহাপুরুষ হবে।

তাছাড়া নবজাতক এই শিশুকে দেখতে এসে আরেকটি বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় সকলে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সাধারণ ধর্ম অনুসারে পৃথিবীর সব শিশুই কাঁদতে থাকে। কিন্তু এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একবারও রোদন করলেন না। কোন কান্নার রব শোনা গেল না। প্রসবকালে মাতাকে কিছুমাত্র কষ্ট বা বেদনা ভোগ করতেও হল না।

যাই হোক মনোমোহিনীদেবীর এই গর্ভজাত শিশু ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন সারা জগতের মধ্যে। সদ্যজাত শিশু অনুকূলচন্দ্রের মুণ্ডিত মস্তক, ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল, ভূমিষ্ঠ হওয়াকালে রোদন না করার প্রভৃতি লক্ষণগুলি নিঃসন্দেহে তার অসাধারণত্বের লক্ষণ। সন্ন্যাসীর মতো এই মুণ্ডিত মস্তক কি তার ভবিষ্যত বিষয়বৈরাগ্য ও নিরাসক্তির প্রতীক নয়? শিশুর পূর্ণায়ত চাঁদের মতো ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল কি ভবিষ্যতের বিশ্বভাবনার প্রতীক নয়? ভূমিষ্ঠ শিশু তার রোদনহীনতার দ্বারা হয়তো এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে মর্ত্যের সাধারণ মানুষের মতো তিনি ত্রিতাপ জ্বালার দ্বারা জর্জরিত হবেন না কোন দিন, উপরন্তু এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করবেন তিনি। মানবজগতের এই হিতসাধনের জন্যই জন্ম হয়েছে তাঁর।

শিশু অনুকূলচন্দ্র মাতুলালয়ে হিমাইতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর নিবাস ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত গোয়াখাড়া গ্রামে। শিবচন্দ্র অতি সদাশয় ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাল্যকালে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করার পর যৌবনে পাবনা জেলা বোর্ডের অধীনে কনট্রাক্টরের কাজ করতেন। এই কাজে

তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও তিনি অন্তরের দিক থেকে ছিলেন একেবারে নির্লোভ। দীন দুঃখী ব্যক্তিদের উপর তাঁর ছিল অসীম করুণা। তিনি এমনই বৎসল ছিলেন যে-বাড়িতে কোন অতিথি বা সাধু সন্ন্যাসী কোনদিন বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না।

শিশু অনুকূলচন্দ্রের মাতা মনোমোহিনীদেবীও বিশেষ গুণশালী ও ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। পিতা রামেন্দ্রনারায়ণ মনোমোহিনীকেও সর্বাধিক স্নেহ করতেন। তিনি শুধু কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিত রাখতেন না, তাঁকে সর্বপ্রকারে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্যও চেষ্টা বা যত্নের ত্রুটি করতেন না। বাল্যকালে একদিন মনোমোহিনীদেবী পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী সদ্‌গুণ থাকলে মানুষ বড় হয়?

উত্তরে রামেন্দ্রনারায়ণ কন্যাকে বলেছিলেন, যারা সত্য কথা বলে, পরের দ্রব্যে লোভ করে না, গুরুজনকে মান্য করে, দীন-দুঃখীদের সেবা করে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি রেখে চলে, তাদেরই লোকে মহৎ বলে এবং ঈশ্বরও তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এইভাবে পিতার চেষ্টায় বালিকা বয়সেই সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মায়া, ত্যাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে মনোমোহিনীর জীবনে। এইসব গুণের জন্যই ভবিষ্যতে সারা দেশের মধ্যে এক মহীয়সী নারী হয়ে ওঠেন মনোমোহিনী।

২

মা মনোমোহিনী ও দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরীর আদর ও স্নেহযত্নে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগলেন শিশু অনুকূলচন্দ্র। শিশুর নবম মাসে কৃষ্ণসুন্দরীদেবী শাস্ত্রবিধি অনুসারে দৌহিত্রের শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান মহাধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন করলেন। এই অনুষ্ঠানে দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুর সামনে ধান্য, মৃত্তিকা, অর্থ, পুস্তকাদি রাখা হলে শিশু মৃত্তিকা ও পুস্তক স্পর্শ করলেন। এতে উপস্থিত সকলে বলেছিলেন, শিশু ভবিষ্যতে ভূস্বামী ও বিদ্বান হবে।

এই অনুষ্ঠানে মনোমোহিনীদেবী চার লাইনের একটি কবিতার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করে পুত্রের 'অনুকূল' নামকরণ করেছিলেন। এই কবিতায় ছিল চারটি পঙ্‌ক্তি।

অকূলে পড়িলে দীনহীন জনে
নুয়াইও শির, কহিও কথা।
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।।

শিশু অনুকূলচন্দ্র অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতো ছিলেন না। শৈশবে তাঁর প্রতিটি

চালচলন ও হাবভাবে এক অপূর্ব প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, তিনি মাত্র সাত আট মাস বয়সে হাঁটতে ও কথা বলতে শিখেছিলেন। এটা সাধারণ শিশুর মধ্যে কেউ কোথাও দেখেনি বা শোনেনি।

শিশুর বয়স যখন দশমাস তখন একবার মনোমোহিনীদেবী ছেলেকে নিয়ে হরিপুর গ্রামে আত্মীয় উমেশচন্দ্র লাহিড়ীর বাড়িতে কিছুকাল বাস করেন। এই সময় চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। উমেশচন্দ্র ছিলেন একজন অতি নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। তাঁর বাড়িতে ছিল গৃহদেবতা গোপালদেবের বিগ্রহ। প্রতিদিন সকালে উঠে স্নানের পর নিজের হাতে ফুল তুলে ঠাকুর পূজো না করে জলগ্রহণ করতেন না।

একদিন উমেশচন্দ্র ঠাকুরপূজো সেরে ভোগরাগ নিবেদন করে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। এমন সময় ঠুং শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি চোখ মেলে দেখেন গোপালদেবের বিগ্রহটি সিংহাসন থেকে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর ঠাকুরের সিংহাসনে বসে শিশু অনুকূলচন্দ্র হাসছে।

উমেশচন্দ্র তা দেখে মনোমোহিনীদেবীকে ডেকে শিশুর এই অদ্ভুত কাণ্ডটি দেখালেন। স্পর্শদোষে বিগ্রহমূর্তি অপবিত্র হয়েছে ভেবে উমেশচন্দ্র পঞ্চগব্যাদি দ্বারা শোধন করে বিগ্রহটিকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে পূজো সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু এবারও ভোগরাগ নিবেদনের আগে উমেশচন্দ্র ধ্যানস্থ হতেই আবার সেই একই শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। এবারেও দেখলেন শিশু অনুকূল আগের মতই সিংহাসনে বসে হাসছেন। তা দেখে উমেশচন্দ্র এবার ক্রুদ্ধ হয়ে মনোমোহিনীদেবীকে ডেকে বললেন, তুমি শিশুকে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শিকলবন্ধ করে রাখ। আমার পূজো সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না। আর দারোয়ানকে ডেকে বলে দাও, সে যেন আমার পূজোর ঘরের দরজায় পাহারা দেয়, কেউ যেন ঘরে ঢুকতে না পারে।

উমেশচন্দ্র এবার নিশ্চিন্তমনে বিগ্রহ শোধনের পর পূজো সম্পন্ন করলেন, কিন্তু ভোগারতির আগে ধ্যানস্থ হতেই আবার ঠুং শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে শিশু অনুকূলের সেই একই কাণ্ড দেখলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি কুপিত হয়ে মনোমোহিনীকে ডেকে জানতে চাইলেন কী করে এই কাণ্ড সম্ভব হল?

মনোমোহিনী আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ তো দরজার শিকল খোলেনি আর দারোয়ানও পাহারা দিচ্ছিল।

একথা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না উমেশচন্দ্র। এই সময় মনোমোহিনী-দেবীও কুপিত হয়ে শিশুকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে তার গালে এক চড় মারলেন এবং কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুই বারবার এই রকম কাণ্ড করছিস?

শিশু তখন কাঁদো-কাঁদো ভাবে অর্ধস্ফুট স্বরে উত্তর করল, ও আমায় দাকে কেন?

শিশুর এই কথা কটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন উমেশচন্দ্র। চমকের সঙ্গে চৈতন্যোদয় হল তাঁর। চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্রোধ প্রশমিত হল এক মুহূর্তে। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন, আমি তো আমার ইষ্টদেব গোপালকে ডাকি। কিন্তু আমার সেই ডাক, আমার সেই অন্তরের আকুল আর্তি এই শিশু বুঝল কি করে? আর কি করেই বা এ শিকলবন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার পাহারা এড়িয়ে ঘরে ঢুকে ঠাকুরের উঁচু সিংহাসনে অনায়াসে বসল? কি করেই বা ঠাকুরের ভারি বিগ্রহমূর্তি সিংহাসন থেকে মাটিতে ফেলল? তবে কি এই শিশু তার গোপালেরই অংশভূত দৈবীশক্তিসম্পন্ন নরশিশুরূপী এক পুরুষ?

একথা ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল উমেশচন্দ্রের শরীর। এক তীক্ষ্ণ উদ্ধত চেতনার আঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ। তিনি তখন সব অভিমান ও রাগ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। আনন্দাশ্রুর অবিরল ধারা ঝরে পড়তে লাগল তাঁর দুচোখ থেকে। তিনি ভাবে বিভোর হয়ে বারবার বলতে লাগলেন, আজ এতদিনে আমার সার্থক হল গোপালের পূজো। বিগ্রহ মূর্তি ছেড়ে গোপাল আজ স্বয়ং আমার পূজো গ্রহণ করেছে।

এই বলে তিনি পূজোর নৈবেদ্যের থালা থেকে যা কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন ছিল তা একে একে তুলে নিয়ে শিশুর কচিমুখে দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, সবাই এসে আমার গোপালের প্রসাদ খেয়ে যা।

অবস্থা স্বাভাবিক হলে উমেশচন্দ্র মনোমোহিনীদেবীকে বললেন, মনু কি আশ্চর্য, এইটুকু ছেলে এইসব কড়া প্রহরা এড়িয়ে এখানে এলই বা কি করে, আর এমন উঁচু সিংহাসনে উঠলই বা কি করে?

একথা শুনে মনোমোহিনী অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে নীরবে শুধুই ভাবতে লাগলেন। শিশুর এই অলৌকিক এবং অদ্ভুত কাণ্ডের কোন কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি। তাই উমেশচন্দ্রের কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

শিশু অনুকূলচন্দ্রের আরেকটি কাণ্ড দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারত না সকলে। সবসময় শিশুর হাতে একটি লাঠি থাকত। এই লাঠিই ছিল তাঁর একমাত্র খেলার বস্তু। কেউ এই লাঠি তাঁর হাতছাড়া করতে গেলেই কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন তিনি। ভবিষ্যতে যিনি জগতের অসংখ্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে ন্যায়, নীতি ও সত্যের পথ দেখাবেন, তাঁর এই লাঠি কি সেই পরিচালিকা শক্তির প্রতীক? ভবিষ্যতের সেই অনাগত সত্যের আভাস কি মূর্ত হয়ে উঠেছে এই লাঠিতে?

শিশুর হাতে সবসময় লাঠি দেখে পাড়ার লোকেরা সবাই তাঁকে আদর করে গাড়োয়ান গাড়োয়ান বলে ডাকত।

শিশু অনুকূলচন্দ্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতা ও দুষ্টুমিও বেড়ে যেতে লাগল। শিশু কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। তাঁর মাথায় সব সময় এক দুষ্টু বুদ্ধি যেন খেলা করে বেড়াত। সেই দুষ্টু বুদ্ধির বশে কখনো তিনি পাড়ায় বসুদের বাগানে গিয়ে গাছপালা তছনছ করিয়া দিতেন, কখনো কোন লোকের বাড়ির গোয়ালে ঢুকে দড়ি খুলে গরু বাছুর ছেড়ে দিতেন। কখনো বা কোন প্রতিবেশীর পূজোর ঘরে ঢুকে বিগ্রহের গা থেকে চন্দনাদি তুলে নিয়ে নিজ গায়ে লেপন করতেন, আবার কখনো বা কারো শালগ্রাম শিলা তুলে নিয়ে এসে বাঁশবাগানের ভিতরে সেই শিলাটিকে পাতা ঢাকা দিয়ে রেখে আসতেন অথবা পুকুরের কাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন।

একদিন পাড়ার এক কবিরাজ মশাই ওষুধ হিসাবে কিছু বিষবটিকা তৈরী করে রোদে শুকোতে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে কাছে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন। একসময় কোন কারণে ক্ষণকালের জন্য সরে যেতেই শিশু অনুকূলচন্দ্র কোথা থেকে ছুটে এসে একমুঠো বিষবটিকা মুখে ভরে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনা দেখে কবিরাজ মশাই, মনোমোহিনীদেবী ও পাড়ার লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এতগুলি বিষবটিকা শিশু কি করে হজম করবে তা ভেবে পেলেন না কেউ। সকলেই ভাবতে লাগলেন, এই বিষবটিকা বা বিষের বড়ি কোন দুরারোগ্য রোগ দূরীকরণের জন্য সাবধানে প্রয়োগ করেন কবিরাজ মশাই। কিন্তু এতগুলি বিষের বড়ির প্রতিক্রিয়া কি করে সহ্য করবে এই শিশু? সে যখন বড়িগুলি মুখে ভরেছে, তখন নিশ্চয় সে তা খেয়ে ফেলেছে। দুঃখে ও হতাশায় ভেঙে পড়লেন মনোমোহিনীদেবী। শিশুর জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিলেন তিনি।

কিন্তু সকলের সব দুশ্চিন্তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সেই সব বিষের বড়ি অবলীলাক্রমে হজম করে ফেললেন শিশু অনুকূলচন্দ্র। তখন শিশুর এই অলৌকিক শক্তির এক অভ্রান্ত পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সবাই।

শিশু অনুকূলচন্দ্রের নানা রকমের দৌরাত্ম্যে প্রায়ই অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার লোকেরা নালিশ করত মনোমোহিনীদেবীর কাছে। কিন্তু একটা বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যেত সবাই। সেটা এই যে, শিশু যে অপরাধই করুক, শাস্তির ভয় দেখালেও সে সরল ভাবে স্বীকার করত তার অপরাধের কথা। কখনো মিথ্যে বলে সে অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করত না।

শিশুর এই সরলতা ও মধুর কণ্ঠের বচন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত, তাকে ভাল না বেসে পারত না।

আরেকটা আশ্চর্য বিষয় এই যে, শিশু অনুকূলচন্দ্রের মুখের কথা ফলে যেত অর্থাৎ সত্যি হত।

একবার জননীদেবী ও কর্তামা অর্থাৎ দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরী নৌকাযোগে কুষ্টিয়া থেকে হিমাইতপুর আসছিলেন পদ্মানদীর ওপর দিয়ে। তখন ছিল বৈশাখ মাস। অকস্মাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠল খরস্রোতা পদ্মানদীর বুকে। উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাখানি যে কোন মুহূর্তে উল্টে বা ডুবে যেতে পারে। মাঝিরা এই অবস্থায় নৌকা চালাতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কে কোথায় ভেসে গেল। চালকহীন নৌকাখানি ডুবুডুবু অবস্থা দেখে মনোমোহিনীদেবী ও তাঁর মাতা কৃষ্ণসুন্দরীদেবী একমনে নামজপ করতে লাগলেন। শিশু অনুকূলের বয়স তখন আড়াই বছর। এমন সময় সহসা মার কোল থেকে শিশু সহসা বলে উঠল মা নৌকো থেকে ছিগ্‌গির নাম।

শিশুর কথা শুনে সেই দারুণ বিপদের মধ্যে মনোমোহিনীদেবী মনে বল পেলেন। তখন তিনি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে এক অজ্ঞাত দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে শিশুকে কোলে নিয়ে আর এক হাতে মার হাত ধরে নৌকা থেকে বিক্ষুব্ধ নদীর বুকে নেমে পড়লেন। কিন্তু কী আশ্চর্যের কথা, তাঁরা প্রবল ঢেউ-এর আঘাতে ভেসে গেলেন না অথবা নদীর গভীর জলের মধ্যে তলিয়ে গেলেন না। নামামাত্রই তাঁরা পায়ের তলায় মাটি পেলেন এবং জল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা অনায়াসে এক চরে এসে উঠলেন। পরে অন্য এক নৌকা ভাড়া করে হিমাইতপুর এসে পৌঁছালেন।

শিশু অনুকূলের বয়স যখন মাত্র তিন, তখন একদিন তাঁর জননী তাঁকে বললেন, অনুকূল, ও বাড়িতে একটি ছেলে হয়েছে। চল যাই তাকে দেখে আসি।

মার কথা শোনা মাত্র শিশু অনুকূলচন্দ্র বললেন, না মা, যাব না। ওকে দেখে কি হবে? ও তো আঠারো দিনের বেশি বাঁচবে না।

পরম বিস্ময় ও দুঃখের কথা, আঠারো দিনেই সেই শিশুটির মৃত্যু ঘটেছিল।

বালক অনুকূলচন্দ্রের বয়স যখন চার তখন আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশী মুকুন্দলাল বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্র একটি সুন্দর ফুলবাগান করেছিলেন। বাগানটির তিনি চারদিকে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতেন। কিন্তু বালক প্রায়ই বাগানের মধ্যে ঢুকে ফুল গাছগুলিকে উপড়ে ফেলতেন। এজন্য হেমেন্দ্র মনোদুঃখে কান্নাকাটি করতেন। বালক অনুকূল একদিন হেমেন্দ্রকে বললেন, তোমার বাগানের গাছগুলি আমি নষ্ট করি। যতবারই তুমি বাগান করবে, ততবারই আমি তা তছনছ না করে ছাড়ব না। তোমার এখানে দুদিনের বাগান করে কি হবে? তুমি তো এখানে থাকবে না।

এই বলে বালক আকাশের দিকে মুখ তুলে আঙুল দেখিয়ে বললেন, তোমার জন্য এখানে এক সুন্দর বাগান করা আছে। সে বাগান এ বাগানের চেয়ে অনেক ভাল।

কী আশ্চর্যের কথা, বালকের এই ভবিষ্যৎ বাণী কিছুদিনের মধ্যেই ফলে গেল। কিছুকালের মধ্যে হেমেন্দ্র কঠিন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হল। এইভাবে দেখা যায় সিদ্ধবাক এক মহাপুরুষের মতো বালক অনুকূলচন্দ্রের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে অচিরেই সত্যে পরিণত হতো।

অনেক সাধু সন্ন্যাসী অনুকূলচন্দ্রের বাল্যকালে অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা উক্তি করতেন।

একবার শিশু অনুকূলচন্দ্রের এক কঠিন পীড়া হয়। সেই সময় শিবচন্দ্রের গৃহে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হন। তিনি জননীদেবীকে শিশুর রোগমুক্তির জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা বলে যান এবং ভবিষ্যৎবাণী করে যান, —এ শিশু মরবে না, এ সামান্য শিশু নয়।

একবার এক প্রবীণ সন্ন্যাসী শিবচন্দ্রের গৃহে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি বালক অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গসুখ বিশেষ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতেন। তিনি প্রায়দিনই নানা মিষ্টান্ন বালককে ভোজন করিয়ে তার ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে নিজে ভোজন করতেন। শিবচন্দ্র সন্ন্যাসীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসী বললেন, এ শিশু সাধারণ শিশু নয়, এ ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার।

একদিন সকালবেলা পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়ে এসে জননীদেবীকে বললেন, এক জ্যোতির্ময়ী উজ্জ্বল নারীমূর্তি চারদিক আলোকিত করে পদ্মার ধারে বসে শিশু অনুকূলকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছেন।

এই কথা শোনামাত্র জননীদেবী সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন, কথাটি সত্যি। শিশু জননীকে দেখামাত্র খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। সহসা সেই নারী মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

একদিন জননীদেবীর শাসনের ভয়ে বালক অনুকূলচন্দ্র গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি বনের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। তখন তাঁর দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরীদেবী বালকের খোঁজ করতে সেই বনের কাছে গিয়ে দেখলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বনের ভেতরটা অন্ধকার। বালক অনুকূল তখন সেই অন্ধকার বনের মধ্যে একটি গাছের তলায় বসে আছেন আর তাঁর গা থেকে এক উজ্জ্বল গোলাপী আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কৃষ্ণসুন্দরীদেবী আরো দেখলেন, বালককে ঘিরে কয়েকটি ছায়ামূর্তি নৃত্য করছে। আর বালক তা দেখে ভয়ের পরিবর্তে আনন্দ পাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে দিদিমা ভীত হয়ে রামনাম উচ্চারণ করতে করতে বালককে কোলে তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে গৃহে চলে গেলেন।

পাড়ার এক বৃদ্ধার বাড়িতে অনেক আম গাছ ছিল। কিন্তু বৃদ্ধা অতি কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন বলে কাউকে কখনও একটি আমও হাতে তুলে দিতেন না। পাড়ার ছেলেদেরও

কখনও গাছে উঠে আম পাড়তে দিতেন না। তাঁর আম নষ্ট হলেও কোন মানুষকে একটিও দান করতেন না। বিষয়টি লক্ষ্য করে বৃদ্ধার স্বভাবের পরিবর্তন করার উপায় খুঁজতে লাগলেন বালক অনুকূলচন্দ্র। একদিন তিনি পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনে সকলে মিলে গাছে উঠে অনেক আম পেড়ে খেতে লাগলেন। তা দেখে বৃদ্ধা প্রতিবাদ করে ছেলেদের গালি দিতে থাকলে অনুকূলচন্দ্র বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে বললেন, মা, তুমি গাছের এতগুলি আম নিয়ে কী করবে? বহু আম নষ্ট হবে আর আমরা একটাও খেতে পাব না? তুমি না দিলে আমরা কোথায় পাব?

বালকের মধুরকণ্ঠ শুনে বৃদ্ধার মন নরম হলো। তাছাড়া বালকের যুক্তিতে চৈতন্য হলো তাঁর। তখন থেকে বৃদ্ধা পাড়ার ছেলেরা গাছে উঠে আম পাড়লে আর নিষেধ করতেন না বরং এক এক সময় তিনি নিজে তাদের ডেকে এনে আম খাওয়াতেন।

এইভাবে দেখা যায় বালক অনুকূলচন্দ্রের প্রতিটি দুরন্তপনার মধ্যে একটি শিক্ষণীয় তাৎপর্য থাকত।

শোনা যায় পিতা শিবচন্দ্র যখন সপরিবারে গোলপুরের (ময়মনসিংহ) রানী অমৃতসুন্দরীর কাছারী বাড়িতে থাকতেন তখন বালক অনুকূলচন্দ্র প্রায়ই তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রানীর ফুলবাগানে ঢুকে গাছপালা সব লণ্ডভণ্ড করে দিতেন। বালকের সুঠাম সুন্দর দেহ, উজ্জ্বল মুখ চোখ ও হাবভাব দেখে প্রহরীরা বালককে বাধা দিতে সাহস পেতেন না। অবশেষে একদিন রানীমা বালক অনুকূলকে দেখে মিষ্টি কথায় এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্বভাবতই সরল প্রকৃতির সত্যবাদী বালক নির্ভয়ে সরলভাবে রানীমাকে বললেন, আমরা যে ফুল বড় ভালবাসি। তাই যখন তখন বাগানে ঢুকে পড়ি। আমরা যদি অবাধে ঢুকতে পাই তাহলে বাগানের গাছপালা কিছু নষ্ট করব না।

বালকের এই সরল সত্য কথা শুনে খুশি হলেন রানীমা। তিনি বালকের কথায় বিশ্বাস করে সেদিন থেকে বাগানের মধ্যে ছেলেদের অবাধ প্রবেশাধিকার দান করলেন।

বালক অনুকূলচন্দ্র তাঁর বাল্য বয়সে শুধু কেবল দুরন্তপনারই পরিচয় দেননি, সকল জীব ও মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম দয়া-মায়া। কোন জীব বা মানুষের কষ্ট দেখলেই মমতায় বিগলিত হয়ে যেত তাঁর অন্তর।

অনুকূলচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র পাঁচ কি ছয় তখন একদিন খেলার সাথীদের অনুরোধে একটি ছিপদাঁড়ি নিয়ে পদ্মায় মাছ ধরতে যান। তার বঁড়শীতে সেদিন একটি বড় মাছ ধরা পড়েছিল। কিন্তু মাছটি বড় বলে তিনি একা টেনে তুলতে পারছিলেন না। সঙ্গীরা তখন সকলে মিলে মাছটিকে টেনে তীরে তুলল। গলায় বঁড়শীর কাঁটা বিঁধে থাকার জন্য মাছটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করতে লাগল। তা দেখে বালকের কোমল প্রাণে ব্যথা জাগল। সমবেদনায় এমনি কাতর হয়ে উঠলেন যে তিনি নিজেই

আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন। তাঁর চিৎকার শুনে চারপাশের লোকেরা ছুটে এলে তিনি তাদের মাছটিকে বঁড়শী মুক্ত করার জন্য সকরুণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন। তখন উপস্থিত লোকেরা বালকের কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে মাছটিকে বঁড়শীমুক্ত করে জলে ছেড়ে দিলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন বালক অনুকূলচন্দ্র।

বালক অনুকূলচন্দ্রদের বাড়ির কাছে একটি জলভরা বিল ছিল। সেখানে জেলেরা প্রায়ই মাছ ধরতে আসত।

একদিন সকালবেলায় বালক অনুকূল সেই বিলের ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন জেলেদের জালে বেশ কতগুলি মাছ উঠেছে। মাছগুলি শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে। তা দেখে বালকের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি তখন জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন, এই মাছগুলি হাটে বিক্রি করে জেলেরা মোট দু টাকা পাবে। তখন তিনি জেলেদের কবল থেকে মাছগুলিকে উদ্ধার করে জলে ছেড়ে দেবার উদ্দেশ্যে দুটি টাকার জন্য বাড়ির দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে লাগলেন। বাড়িতে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে দুটি টাকার জন্য কাতর ভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তখন জননীদেবী অতিষ্ঠ হয়ে দুটি টাকা তাঁর হাতে দিলেন। ছেলে কেন এই টাকা চাইছে তা তখন না জানলেও জননীদেবী জানতেন তাঁর ছেলে কখনও বাজে খরচ করবে না।

অনুকূলচন্দ্র তখন টাকা দুটি নিয়ে আবার উর্ধ্বশ্বাসে বিলের ধারে ছুটে গিয়ে জেলেদের হাতে সেই টাকা দিয়ে জালমুক্ত করলেন মাছগুলিকে। জেলেরা তাঁর অনুরোধে মাছগুলিকে ছেড়ে দিল।

তখনকার মতো বালক অনুকূল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেও তিনি ভবিষ্যতের কথা না ভেবে পারলেন না। তিনি ভাবলেন জেলেরা তো আবার এই বিলে মাছ ধরতে আসবে। আবার তাদের জালে অনেক মাছ পড়বে। এইভাবে কত মাছেরই না প্রাণ যাবে। এই ভেবে তিনি ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, হে দয়াল ঠাকুর, বিলটা যেন তোমার কৃপায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। জেলেরা যেন এখানে আর মাছ ধরতে না পারে।

পরম বিস্ময়ের কথা এই যে, কিছুদিনের মধ্যেই বালকের মনস্কামনা পূরণ করেছিলেন ঈশ্বর। সরল প্রাণ বালকের এই জীবপ্রেমজনিত সকাতর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারেননি ঈশ্বর। শোনা যায় কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিলটি শুকোতে থাকে এবং ক্রমে একেবারে জলশূন্য হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে তা কৃষিযোগ্য ভূমিতে পরিণত হয়।

সংবেদনশীল বালক অনুকূলচন্দ্রের অন্তর যেমন আর্ত জীবদের দুঃখে কাতর হয়ে উঠত, তেমনি পিতামাতার দুঃখ তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। বাল্য

বয়সেই তাঁর অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তির নানা পরিচয় পাওয়া যায়। বালক অনুকূলের বয়স যখন পাঁচ তখন একবার তাঁর পিতৃদেব শিবচন্দ্র দীর্ঘ রোগভোগে শয্যাগত হয়ে পড়েন। তখন বাড়িতে আর কোন লোক না থাকায় বালক অনুকূলকে ঐ বয়সে তিন মাইল হেঁটে পাবনা শহরে গিয়ে পিতার জন্য ওষুধ আনতে হতো। একদিন ইছামতী নদী পার হবার সময় তাঁর ছাতাটি হারিয়ে যায়। একথা শুনে জননীদেবী দুঃখ প্রকাশ করতে থাকলে বালক তাঁকে বলেন, মা, তুই মোটেই ভাবিস নে, আমার ছাতা লাগবে না, ছাতা ছাড়াই আমি যেতে পারবো।

এই সময় জননীদেবীর সংসারে বড়ই অভাব অনটন চলছিল। অতিকষ্টে তিনি সংসারের দায়ভার বহন করছিলেন। কিন্তু জননী সেই অভাব অনটনের কথা ছেলেকে জানাতে চাইতেন না। কিন্তু মাতৃভক্ত ও বুদ্ধিমান বালক মার মুখ দেখে সবকিছু বুঝে নিতেন এবং নানাবিষয়ে মাকে সাহায্য করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন।

একদিন মা যখন মুড়ি ভাজছিলেন তখন বালক অনুকূল মাকে সাহস দিয়ে বললেন, তুই ভাবিস নে মা, তুই খুব মুড়ি ভাজবি আর আমি বেচবো, দেখিস তখন তোর কত টাকা হবে।

মাকে সাহায্য করার জন্য বালক সব সময় মায়ের কাছে কাছে থাকতেন। কোন কাজে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর বুদ্ধিবলে সে কাজ সুষ্ঠভাবে করতেন। ছোট ভাই বোনেরা মাতৃদেবীর আহ্নিকের সময় তাঁকে বিরক্ত করলে বালক অনুকূল ভাইবোনদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ভুলিয়ে রাখতেন।

একদিন বালক কোন অপরাধ করে বসলে মাতৃদেবী একটি বাঁশের কঞ্চি হাতে তাঁর পিছু ধাওয়া করেন। বালক মার শাসনের ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। মা তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না। তখন দুপুরবেলা, প্রখর রোদে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন জননীদেবী। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিল অবিরল ধারায়। হঠাৎ পিছন ফিরে মার এই অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বালক অনুকূল। তিনি তখন নিজে এগিয়ে এসে মাকে ধরা দেবার জন্য তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিজের হাতে মার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তাঁর ঘাম মুছিয়ে দেন।

পরবর্তী কালে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র একদিন বাল্যস্মৃতি আলোচনা কালে ভক্তদের বলেন, ছেলেবেলায় একদিন দেখি, দুপুর গড়িয়ে গেলেও রান্না হয়নি বাড়িতে। আমরা তখন ক্ষুধায় কাতর। মা তখন আমাদের নিয়ে গল্প করতে শুরু করলেন। মায়ের মুখে গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা মনে নেই। ঘুম ভাঙলে দেখি মা কোথা থেকে কিছু খুদ যোগাড় করে এনে তাকে ফ্যানসুদ্ধু থালা করে আমাদের খেতে

দিয়েছেন। সেই সামান্য ফ্যানভাত কী মিষ্টি যে লাগত তা বলে বোঝান যাবে না। মায়ের হাতের দেওয়া যেকোন জিনিসই বড় মধুর লাগত। মা যখন নাম করতেন তখন বড় ভাল লাগত। আবার যখন সারাদিন পরিশ্রমের পর প্রার্থনায় বসতেন তখন মায়ের পায়ের উপর মাথা রেখে বার বার প্রণাম করতে ইচ্ছা হতো।

অনুকূলচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী কৃষ্ণকমল দত্ত। পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেট হন। বাল্যকালে অনুকূলচন্দ্র তাঁকে আদর করে ভাসনা বলে ডাকতেন। অবসর প্রাপ্তির পর কৃষ্ণকমলবাবু তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিমন্থন করে খেলার সাথী অনুকূলচন্দ্রের ছেলেবেলার কয়েকটি কথা অনেকের কাছেই প্রকাশ করেন। তিনি বলতেন, ছেলেবেলায় অনুকূল ছিল খুবই সরল প্রকৃতির ও বুদ্ধিমান। তার পরিচালনাশক্তি ছিল অসাধারণ। তার এমনই ব্যক্তিত্ব ছিল যে আমরা আমাদের ছেলেদের দলের মধ্যে তাকেই প্রধান করেছিলাম এবং তার কথা সবসময় মেনে চলতাম। খেলার সাথীদের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া বাধলে অনুকূল তা মিটিয়ে দিত। সে সব কিছুর শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা করে দিত। ছেলেরাও তার কথা মেনে নিত। এইভাবে ভবিষ্যতে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অসাধারণ পরিচালিকা শক্তির আভাস তাঁর বাল্যকালেই পাওয়া যায়।

৩

বালক অনুকূলচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তাঁর হাতেখড়ি হয়। তারপর বাড়ির কিছুদূরে কাশীপুর হাটে কৃষ্ণচন্দ্র বৈরাগী নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। এই পাঠশালায় দু বছর পড়ার পর তিনি কাশীপুর গ্রামের ব্রজনাথ কর্মকার ও ভবানীচরণ পাল এই দুই প্রবীণ শিক্ষকের কাছে কিছুকাল বিদ্যাভ্যাস করেন। এরপর ১৩০৫ সালে তাঁর বয়স যখন দশ তখন পাবনা শহরে পাবনা ইনস্টিটিউশন নামক এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয়। বাড়ি থেকে প্রতিদিন তাঁকে হেঁটে পাবনার স্কুলে যেতে হত।

এরপর এগার বছর বয়সে বালক অনুকূলচন্দ্রের শুভ উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়।

পিতামাতার প্রথম সন্তান ও দিদিমার অতি আদরের দুলাল ছিলেন বলে অল্পবয়সেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় অনুকূলচন্দ্রকে। ১৩১৩ সালের ২৮শে শ্রাবণ আঠার বছর বয়সে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধোপাদহ গ্রাম নিবাসী রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রথমা কন্যা দ্বাদশ বর্ষীয়া সরসীবালাদেবীর সঙ্গে তার

শুভপরিণয় কার্য সুসম্পন্ন হয়। তখন তিনি পাবনা ইনস্টিটিউশনের অষ্টম মানের ছাত্র ছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন গ্রামবাসীদের সকলের আদরের পাত্র। তাই সকলের সহযোগিতায় তাঁর বিবাহ কার্য উপলক্ষে গ্রামে সপ্তাহব্যাপী আনন্দ উৎসব চলতে থাকে। এই সময় সকল গ্রামবাসীসহ আত্মীয়স্বজন ও নানা স্থানের অতিথি অভ্যাগতরা ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হত। একবার বালক অনুকূলচন্দ্রের রোগমুক্তির কামনায় দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরীদেবী তাঁর দেহের সমান ওজনের বাতাসা দিয়ে হরিলুঠ দেওয়ার মানত করেছিলেন। এই বিবাহ উৎসবে সেই হরিলুঠ দিয়ে মানত পূরণ করা হয়।

বিয়ের পর কিছুকাল পাবনা জেলা স্কুলে পড়েন অনুকূলচন্দ্র। তারপর তাঁর পিতার চাকুরীস্থল ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমিরাবাদে গমন করেন। সেখানে নিকটবর্তী রাইপুরের হাই স্কুলে ভর্তি করা হয়। এই রাইপুরা স্কুলে পড়ার সময় অনুকূলচন্দ্রের এক আশ্চর্য নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুকূলচন্দ্র ঘটনাক্রমে জানতে পারলেন তাঁদের স্কুলের এক শিক্ষকের চরিত্রদোষ ছিল। ইস্কুল ছুটির পর তিনি রোজ কুস্থানে যেতেন। তাতে মনে ব্যথা পেতেন অনুকূলচন্দ্র। একদিন তিনি সাহস করে শিক্ষক মহাশয়ের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য সংকল্প করে নামজপ করতে করতে সেই শিক্ষকের পায়ে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁকে কুস্থানে যেতে নিষেধ করেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁর ছাত্র অনুকূলের মর্মবেদনা দেখে চৈতন্য লাভ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে সংকল্প করলেন তাঁর জন্য একটি ছাত্র যখন এত মনোবেদনা পাচ্ছে, তখন তিনি আর এ কাজ করবেন না। সেই থেকে অনুকূলচন্দ্রের এই চেষ্টায় সেই শিক্ষকের স্বভাব আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর চরিত্রদোষ কাটিয়ে ভাল হয়ে ওঠেন।

আমিরাবাদে পিতা শিবচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। বেশ সুখেই কাটছিল তাঁর সংসার। কিন্তু এই সময় তাঁর দুই শিশু সন্তানের অকালমৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁর মধ্যম পুত্র দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শিবচন্দ্রের মনোবল একেবারে ভেঙে যায়। তিনি তখন আমিরাবাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমাইতপুরে এসে নিজবাড়িতে বাস করতে থাকেন।

এইসময় অনুকূলচন্দ্র নৈহাটিতে তাঁর মাসতুতো ভগ্নীপতি শশীভূষণ চক্রবর্তীর বাড়িতে থেকে সেখানকার এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আবার অধ্যয়ন শুরু করেন। অবশেষে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু কোন বিশেষ কারণে শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষা দেওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। এই পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুতও

হননি।

এরপর অনুকূলচন্দ্র অভিভাবকগণের নির্দেশে কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারি পড়ার জন্য বৌবাজারে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু এই সময় পিতা শিবচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকার জন্য ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ যোগানোর সামর্থ্য তাঁর ছিল না। অতীতে এককালে কলকাতার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় শিবচন্দ্রের কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। সেই টাকা তিনি যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেননি। পরে অনুকূলচন্দ্র কলকাতায় পড়তে গেলে সেই আত্মীয় অনুকূলচন্দ্রকে তাঁর দেনার টাকা থেকে প্রতি মাসে দশ টাকা করে দেবেন, এই মর্মে পত্র মাধ্যমে শিবচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই দশটি টাকাই ছিল অনুকূলচন্দ্রের একমাত্র সম্বল। প্রতিমাসে এই টাকাতেই খাওয়া পরা ও পড়ার সব খরচ চালাতে হত। এর জন্য অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হত অনুকূলচন্দ্রকে। টাকার অভাবে ছাত্রাবাসে থাকতে না পেয়ে গ্রেস্ট্রীটের এক কয়লা গুদামের এক ধারে অতি কষ্টে মাথাগোঁজার মতো একটু জায়গা করে নেন তিনি। কয়লার গুঁড়োয় তার জামাকাপড় খুবই ময়লা হত। কাপড় কাচার জন্য সাবানও জুটতো না তাঁর। বাস ট্রামের ভাড়া না থাকায় রোজ দশ-বার মাইল করে হাঁটতে হত তাঁকে।

মাত্র দশ টাকায় সারা মাস চালাতে হত বলে দিনে খাওয়ার জন্য মাত্র চার আনা খরচ করতেন। একটি হোটেলে তিনি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেকালে সস্তার বাজার হলেও আট আনার কমে কোথাও পেট ভরে খাওয়া হত না। তাই হোটেলওয়ালা চার আনায় তাঁকে কেবল ভাত আর ডাল অথবা আনাজ ছাড়া ঝোল দিত। রাত্রিতে কোনদিন কিছু মুড়ি ছোলা বা নারকেল খেতেন। কোন কোন দিন অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকতে হত তাঁকে। প্রতিদিনই মাত্র একটা জামা বা একখানি কাপড় পরতে হতো তাঁকে। রবিবার বা কোন ছুটির দিন গামছা পরে কাপড় জামা পরিষ্কার করতেন। তখন পায়ে তাঁর কোন জুতো ছিল না।

পরবর্তীকালে একটি জুতোর দোকানে জুতো কিনতে যাওয়ার ঘটনার কথা প্রসঙ্গে নিজের মুখে বর্ণনা করেন ঠাকুর। তিনি বলেন, দোকানে জুতো কিনতে গেলাম। আমার কাছে যে সামান্য পয়সা ছিল, তাই দোকানদারের হাতে দিয়ে বললাম—ভাই, এক জোড়া চটি জুতো দাও। দোকানদার আমাকে জুতো দেখালো, সদ্য কাঁচা চামড়ার তৈরী সে জুতোর কি দুর্গন্ধ। আমি বললাম, ও জুতো নেব না। তখন দোকানদার জুতো তো দিলই না, পয়সাও ফেরত দিল না। বরং ঠাট্টা করে বলল— তের আনা পয়সায় কি জুতো কেনা যায়।

তাঁর নানা গুণাবলীর জন্য কলেজের ছাত্র ও সহপাঠীরা সবাই তাঁকে ভালবাসত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর দুরবস্থা দেখে তাঁকে কিছু করে সাহায্য দিতে চাইত। কিন্তু তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন অনকূলচন্দ্র কারোর কাছ থেকে কোন দান বা সাহায্য নিতেন না। তবে একদিন কলেজের এক শিক্ষক তাঁর অতি ময়লা জামা কাপড়ের জন্য ক্লাস থেকে বাইরে বের করে দেন।

গ্রে স্ট্রীটের এক কয়লার গুদামের একপাশে একটুখানি জায়গায় শোবার ব্যবস্থা করেন তিনি। সারা দিন প্রায় বাইরে বাইরে থাকতেন। এক একদিন সেই কয়লার গুদামেও শোবার জায়গা পেতেন না। তখন তিনি ফুটপাতে অথবা শিয়ালদা স্টেশনের শানবাঁধানো উঠোনে শুয়ে রাত কাটাতেন। শীতের রাত হলে একখানি খবরের কাগজ পেতে ও আর একখানি কাগজ গায়ে চাপা দিয়ে শুতেন তিনি। কলকাতায় তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল। তিনি মনে করলে এক একদিন এক এক বাড়িতে স্বচ্ছন্দে খেতে ও থাকতে পারতেন। কিন্তু কোন দিন কারো বাড়িতে যেতেন না তিনি। এইভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের প্রতিপদে এক অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাবলম্বনের পরিচয় দেন অনুকূলচন্দ্র যা কোন সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। থাকার ব্যবস্থা না থাকার জন্য রাত্রিতে আলোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাত্রিতে তাই রাস্তার আলোতেই পড়া সারতে হতো। অদ্ভুত ছিল তাঁর মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি। বইতে একবার যা পড়তেন বা ক্লাসে শিক্ষকদের মুখ থেকে একবার যা শুনতেন তা একেবারে গাঁথা হয়ে যেত তাঁর অন্তরে। ভর্তির সময় এই মেধার জোরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিলেও অধ্যক্ষ তাঁকে ভর্তি করেন। অধ্যক্ষ প্রথমে তাঁকে ভর্তি করতে চাননি পরে তাঁর যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য এক বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সে পরীক্ষায় স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হন অনুকূলচন্দ্র।

এত বাধা বিপত্তি অভাব অনটন ও কষ্ট সত্ত্বেও পড়াশোনায় কোনদিন নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব ছিল না অনুকূলচন্দ্রের। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকদের স্নেহ আকর্ষণ করেন।

পরমপিতা ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অবিচল ভক্তি ছিল অনুকূলচন্দ্রের। একমাত্র পড়ার সময় ছাড়া সবসময়ই তিনি নাম জপ করে যেতেন মনে মনে। তিনি মনে করতেন তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাসের একাগ্রতা পরীক্ষার জন্যই ঈশ্বর যেন এই এত দুঃখ কষ্ট দান করছেন। তাই ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে সব দুঃখ কষ্ট অবলীলাক্রমে সহ্য করে যেতেন অনুকূলচন্দ্র। জীবনে কোন দুঃখ কষ্টই তাঁর মাথাকে নত করতে পারত না। কোন অবস্থায় তাঁকে টলাতে পারত না বিন্দুমাত্র। এ

বিষয়ে তাঁর মন ছিল লোহার মতো কঠিন ও অনমনীয় আর হৃদয় ছিল সিংহের মতো সাহসী। তবে পরমপিতার ধ্যান ও নাম জপ থেকে অদ্ভুত ও অমিত এক আত্মশক্তি লাভ করতেন তিনি। তাঁর দেহ মনের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করতেন না তিনি। এমনকি শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে পথের উপর বিনা শীতবস্ত্রে শুয়ে কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি সমানে নাম জপ করে যেতেন। এই নাম জপের প্রভাবে সেই প্রবল শীতের মধ্যেও যেন এক তাপপ্রবাহ ঢেউ খেলে যেত তাঁর হিম হয়ে যাওয়া প্রতিটি স্নায়ু ও শিরার মধ্যে। হিমে জমে যাওয়া তাঁর দেহের রক্ত তাঁর স্বাভাবিক তরলতা ফিরে পেয়ে স্বচ্ছন্দে চলাচল করত। এইভাবে নাম জপ করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

কয়েক মাস ধরে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে দীর্ঘ অবকাশের পর কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়েও শান্তি পেতেন না অনুকূলচন্দ্র। ক্রমাগত অর্ধাহারে থাকার জন্য তাঁর সুঠাম ও সুগঠিত শরীর কিছুটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে পড়ে তাঁর গৌরবর্ণ দেহকান্তি। তবু লেখাপড়ার সাধনায় এমন ভাবে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি যে শরীরের প্রতি কোন দৃষ্টি থাকত না তাঁর। অধ্যয়নই ছিল তাঁর তপস্যা। সেই তপস্যায় তাঁকে সিদ্ধি লাভ করতে হবেই।

দীর্ঘ ছুটির সময় বাড়ি গেলেই পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা চাইতেন না তিনি বাড়িতে বেশ কিছু দিন থাকেন। তাঁরা বলাবলি করতেন পড়া বন্ধ করে বাড়িতে বউ-এর জন্য বসে আছে। তাই ছুটি শেষ হবার আগেই আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হতো অনুকূলচন্দ্রকে। আবার শুরু হতো তাঁর সেই একটানা জীবনসংগ্রাম।

কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি চর্চা করতেন অনুকূলচন্দ্র। গরীব দুঃখী অনেককেই তিনি বিনা মূল্যে ওষুধ দিতেন। তাঁর চিকিৎসায় রোগীরা সহজেই সেরে উঠত।

একবার মূলাজোর কলেজের অধ্যাপক কোমরের ব্যথায় অতিশয় কষ্ট পাচ্ছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় একজন লোক মারফত অনুকূলচন্দ্রের কাছ থেকে ওষুধ আনিয়ে নিয়মিত সেবন করেন। তাতে তাঁর রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। তখন তিনি অনুকূলচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকেন।

সঙ্গীত ও কবিতা রচনার ঝোঁক ছিল অনুকূলচন্দ্রের। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র-জীবনে একটি খাতায় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে সেই সব গান ও কবিতা লিখে রাখতেন তিনি। এবং মাঝে মাঝে কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে সেগুলি পড়ে শোনাতেন। তাঁর এই সব সহজ সরল রচনাগুলি. অন্তরের উচ্চভাবসম্পদে ছিল পরিপূর্ণ। অন্তরের গভীর

আবেগানুভূতিতে প্রাণবন্ত এই সব রচনা সহজেই মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করত।

অবশেষে দীর্ঘ জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় অনুকূলচন্দ্রের। কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের অধ্যয়ন শেষ করে এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হিমাইতপুরে ফিরে যান তিনি।

৪

পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবসার কথা না ভেবে চাকরির চেষ্টা করতে থাকেন অনুকূলচন্দ্র। বাড়ি থেকেই তিনি ডাক্তারি কাজের এক চাকরির জন্য শিলাইদহ ঠাকুর এস্টেটে একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন। চাকরির প্রতি তাঁর কোন বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও পিতামাতার কথাতে তিনি দরখাস্ত পাঠান। সংসারে তখন অর্থের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাই পিতামাতা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করতেন, তাঁদের যোগ্য পুত্র কিছু আয় উপার্জন করে সংসারের হাল ধরবে।

চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আবেদনপত্র যে গৃহীত হবে তা আশা করতে পারেননি অনুকূলচন্দ্র। যা হোক, কিঁছুদিনের মধ্যে নিয়োগপত্র এসে হাজির হলো বাড়িতে। চাকরিটির মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া বিনা ভাড়ায় বাসস্থান ও আসবাবপত্র ব্যবহার এবং স্বেচ্ছামত স্বাধীনভাবে চিকিৎসার দ্বারা অতিরিক্ত অর্থোপার্জন প্রভৃতি আরো অতিরিক্ত নানারকম সুযোগ সুবিধাও ছিল।

কিন্তু কী আশ্চর্যের কথা নিয়োগপত্র পাঠ করে আনন্দের পরিবর্তে এক নিদারুণ বিষাদে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন অনুকূলচন্দ্র। আনন্দের পরিবর্তে এক অজানা আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপতে লাগল তাঁর সারা শরীর। তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন অর্থের বিনিময়ে রোগার্ত মানুষকে সেবাদান তাঁর সত্ত্বাবিরোধী কাজ। গোলামী বা দাসত্ব করে নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়ে অর্থ উপার্জন করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। এই কথা ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি।

অথচ তিনি জানতেন তাঁদের সংসারে খুবই অভাব অনটন চলছিল এবং তাঁর পিতা তাঁর নিয়োগপত্রটি দেখলেই তাঁকে চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন। তাই পিতাকে না জানিয়ে সেই নিয়োগপত্রটি তৎক্ষণাৎ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন অনুকূলচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির এক নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। সেই মুহূর্তে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করে সর্ব সাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং

এই ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হবেন। তাতে অর্থ উপার্জন যা হয় হবে। কোনরকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ ছাড়া অর্থের প্রতি কোনদিনই কোন লোভ ছিল না তাঁর।

যাই হোক তাঁর এই সংকল্প সাধনের জন্য অনুকূলচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই বসন্তকুমার সাহা চৌধুরী নামে এক প্রতিবেশীর সহায়তায় তাঁর গৃহে একটি ডিসপেন্সারী বা চিকিৎসালয় স্থাপন করে চিকিৎসাবৃত্তি আরম্ভ করলেন। অ্যালোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী উভয় চিকিৎসা পদ্ধতিতেই অভিজ্ঞ ছিলেন অনুকূলচন্দ্র। যে রোগী যে চিকিৎসায় সহজে আরোগ্য লাভ করবে বলে তিনি মনে করতেন তার জন্য সেই চিকিৎসা ব্যবস্থাই করতেন।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই তরুণ চিকিৎসক হিসাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অনুকূলচন্দ্রের নাম যশ। তাঁর সহজ সরল জীবনযাত্রা রোগীদের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মমতা ও ভালবাসায় এবং চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ও নৈপুণ্য গ্রামের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব লোককে আকৃষ্ট করল। কোন রুগীর বাড়িতে গিয়েই তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে প্রথমে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। তাঁর মমতামাখা স্পর্শ পেয়ে রোগীর মনে হত তার রোগ অর্ধেক সেরে গেছে। সে রোগযন্ত্রণার কথা ভুলে যেত। এরপর রোগীর পাশে বসে মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে রোগের বিবরণ জানতে চাইতেন। তাঁর মধুর আশ্বাস বাণীতে রোগী প্রচুর সাহস পেত মনে। তার রোগ অবশ্যই সেরে যাবে এই আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠত রোগীর মনে।

অনুকূলচন্দ্র গ্রামের গরীব দুঃখীদের দরদী বন্ধু কোন গরীব রোগীর কাছে পয়সা না থাকলে তিনি নিজে ওষুধ কিনে তা তাকে বিনা পয়সায় দিয়ে তার রোগ সারিয়ে দিতেন। দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য তাঁদের বাড়িতে যাবার সময় সাগু, বার্লি, মিছরি প্রভৃতি পথ্য বস্তু নিজেই কিনে নিয়ে যেতেন। তাঁর এই সেবা পরায়ণতার জন্য গ্রামের লোকেরা তাঁকে কেবল চিকিৎসক হিসাবে দেখতেন না, তাঁকে এক পরম সুহৃদ বলে মনে করতেন। গ্রামের মধ্যে কোন বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে অনুকূলচন্দ্রকে না দেখিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থা করত না সেই বাড়ির লোকেরা। কারোর রোগ চিকিৎসা একবার শুরু করলে সে রোগ না সারা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়তেন না অনুকূলচন্দ্র।

রোগীদের প্রতি অনুকূলচন্দ্রের মমতাবোধ এমনই গভীর ছিল যে কোন রোগী তাঁর চিকিৎসাধীনে এলেই তার রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। রোগীর অবস্থা জানবার জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত তাঁর মন। রোগীর বাড়ি থেকে কোন খবর না পেলে তিনি নিজে তার বাড়িতে গিয়ে খবর নিতেন।

দুস্থ বিপন্ন গ্রামবাসীদের জন্যে গভীর দরদ ছিল তাঁর। তাদের সেবার জন্য সদাসর্বদা

প্রস্তুত হয়ে থাকতেন তিনি। একবার হিমাইতপুর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে কলেরা রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। এই সময় চিকিৎসার অভাবে বহু লোককে এই রোগের কবলে পড়ে প্রাণ দিতে হয়। কলেরা রোগ সংক্রামক ব্যাধি বলে তাঁর পিতামাতা অনুকূলচন্দ্রকে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে যেতে দিতেন না। তাই রোগীদের সেবা করার জন্য ছটফট করতো তাঁর মন প্রাণ। বাড়িতে কিছুতেই শান্তি পেতেন না মনে। একদিন কোন প্রকারে পিতামাতাকে বুঝিয়ে বলে কলেরা রোগীদের সেবার জন্য তাঁদের অনুমোদন লাভ করেন। তিনি তাঁদের বলেন, দেখুন, এত করে ডাক্তারী বিদ্যাটা শিখলাম, দুস্থের সেবায় বিশেষ এই সংকটকালে যদি লোকের প্রাণ-রক্ষায় তা লাগাতে না পারলাম, তবে আর কি হলো? আমারই বা বেঁচে থাকার মূল্য কি? কত লোক চারদিকে অচিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করে বসে বসে তা দেখে কি ভাবে সহ্য করবো।

তাঁর কাতর প্রার্থনায় তাঁর পিতামাতা তাঁকে মাত্র একদিনের জন্য সেখানে যাবার অনুমতি দিলেন।

পরদিন ভোরবেলায় কিছু আহারাদি করে রোগার্ত ব্যক্তিদের দেখার জন্য মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাত্রা করলেন অনুকূলচন্দ্র। একটি লোক তার ওষুধের বাক্স নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে লাগল। যে সব বাড়ির লোকেরা এই রোগে আক্রান্ত হয়, সেই সব বাড়িতে তিনি নিজে থেকে গিয়ে রোগীদের যত্নের সঙ্গে দেখে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে সেবা শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দান করেন। এইভাবে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে রোগীদের ওষুধ দিয়ে বেড়াতে থাকেন। এইভাবে হিমাইতপুর, কাশীপুর, প্রতাপপুর, ছাতনি, পৈলানপুর, নাজিরপুর প্রভৃতি গ্রামগুলো ঘুরে সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। তাঁর এই চিকিৎসার ফলে বহু রোগার্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়।

পরদিন থেকে রোগীদের প্রত্যেকের অবস্থা আশ্চর্যরূপে দ্রুত উন্নতির দিকে যেতে থাকে। তখন বাড়িতে থেকেই তিনি লোক মারফত ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করে নিয়মিতভাবে রোগীদের চিকিৎসার কাজ চালাতে থাকেন। তাঁর এই সময়োচিত ও স্বতঃস্ফূর্ত সেবাদানের ফলে ও অব্যর্থ চিকিৎসার গুণে কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে কলেরা রোগের বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণও দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে থাকে।

কোন রোগীর চিকিৎসা শুরু করার সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে অনুকূলচন্দ্র প্রথমে রোগের মূল কারণটি অনুসন্ধান করে তা বার করতেন। তারপর সঠিক ওষুধ

প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে রোগ নিরাময় করতেন। এই জন্য অল্পকালের মধ্যেই চিকিৎসা ব্যাপারে এক অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন তিনি। ডাক্তার হিসাবে তাঁর নামডাক দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। সন্ধানী দৃষ্টির ফলে তাঁর বোধশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ ও গভীর হয়ে উঠেছিল যে রোগীকে দেখামাত্র তাঁর রোগের কারণ উপসর্গ ও অবস্থাদি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগের নির্দিষ্ট ওষুধটির কথাও মনে পড়ে যেত তাঁর। তাঁর ওষুধ নির্বাচনের এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে সে ওষুধ অব্যর্থভাবে কাজ করতো এবং দুরারোগ্য রোগও অল্পকালের মধ্যে সেরে উঠত। তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সেই অঞ্চলের লোকেরা মনে করত, তিনি মন্ত্র জানেন, দৈবশক্তি ছাড়া কেউ কখনো এমন কঠিন রোগ এত সহজে সারাতে পারে না।

পরবর্তীকালে রোগ নির্ণয় ও রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বা দৈবশক্তির কথা উঠলে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ফ্রী প্রেসের রিপোর্টার ইন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে বলেন, আমি অলৌকিক ও অদ্ভুত কিছু জানি না এবং করিও না, মানুষে ঐরকম যা-তা বলে। আমাকে যেমন দেখছেন, আমি তাই। অদ্ভুত আমরা তখনি জানি ভাবি, যখন আমরা তার কারণ জানি না। আপনি শর্টহ্যাণ্ডে লেখেন, এটা আমার কাছে অদ্ভুত কারণ আমি এটা জানি না, আমি যখন হোমিওপ্যাথী প্র্যাকটিস করতাম তখন ওষুধ সম্বন্ধে রোগের কারণ সম্বন্ধে এবং মানুষ সম্বন্ধে মনে মনে ভাবতাম।

একদিন কাশীপুরের রাস্তা দিয়ে রোগী দেখতে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় একটি মুসলমানকে মাথায় ধামা ও হাতে কয়েকটি বোয়াল মাছের বাচ্চা নিয়ে পাবনা বাজার থেকে আসতে দেখলাম। তাকে দেখেই আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধটির কথা মনে পড়ে গেল। আমি তাকে বললাম, ভাই তুমি এ মাছ খেয়ো না, তোমার অত্যন্ত পেটের অসুখ করবে।

আমার কথা শুনে সে বলল, খোদা যখন পয়দা করেছেন তখন একদিন তো মরতেই হবে।

এই বলে সে চলে গেল।

রোগী দেখে বাড়ি ফিরেছি। কিছুক্ষণ পর পথে যে লোকটিকে দেখেছিলাম, তার এক আত্মীয় এসে আমাকে বলল, সেই লোকটি পাবনা থেকে এসে হাতপা ধুয়ে তামাক খাচ্ছিল। এমন সময় তার পেট কনকন করে ওঠে এবং দুইবার দাস্ত হয়। হাত পা ঠাণ্ডা, গা বমিবমি ভাব, খিল ধরার মত হয়েছে, তাই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছে।

আমি গিয়ে তাকে ভিরাট্রাম এলবাম ৩০ দিলাম। রোগীও আরোগ্য হলো। আমার ওষুধ মন্ত্রপূতের মতো কাজ করায় আমি যে তাকে ওষুধ দিয়ে সারিয়েছি তা তার

বিশ্বাস হলো না। সে লোকের কাছে বলে বেড়াতে লাগল আমি অলৌকিক বিদ্যা জানি এবং দৈবশক্তিতে রোগ সারাই।

আর এক ঘটনায় রোগীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রোগ নির্ণয়ের তাঁর এক অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার নজিরপুর নিবাসী দুর্গানাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের বড় ভগিনী আমাশয় রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগিণীর অনুরোধে দুর্গানাথবাবু অনুকূলচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। কিন্তু রোগীকে দেখেই অনুকূলচন্দ্র দুর্গানাথবাবুকে একান্তে ডেকে বললেন, দাদা, আমি ওষুধ দিচ্ছি বটে, কিন্তু রোগীর অবস্থা দেখে মনে হয় এ রোগী বাঁচবে না।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে দুর্গানাথবাবু বললেন, সেকি! এ তো আমাশয় রোগ। এ তো হয়েই থাকে।

অনুকূলচন্দ্র তখন বললেন, এ রোগটা বাহ্যত কঠিন না হলেও আমার মনে হয় অচিরেই তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। চিকিৎসায় তা রোধ করা সম্ভব হবে না।

আশ্চর্যের বিষয় চতুর্থ দিনে রোগ সাঙঘাতিক আকার ধারণ করল এবং রোগিণী তাতেই মারা গেল।

অনুকূলচন্দ্রের রোগ নির্ণয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ও অব্যর্থ রোগচিকিৎসা দেখে শুধু আশপাশ গ্রামের নয় দূর দূরান্ত থেকেও বহু রোগী এসে ভিড় করতে লাগল বাড়িতে। কারণ অনেক দুরারোগ্য রোগও অব্যর্থ ওষুধ প্রয়োগের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সেরে যেত। কিন্তু রোগী দেখতে যাওয়ার ভিজিট বা রোগ চিকিৎসার জন্য অনুকূলচন্দ্র কিছুই চাইতেন না। রোগীরা অবস্থা অনুযায়ী যে যা দিত তিনি তাই গ্রহণ করতেন হাসিমুখে। এইভাবে রোগীর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাওয়ার ফলে আপনা থেকেই অর্থ উপার্জন হতে লাগল অনেক বেশি। সেই সময় মাসে অনুকূলচন্দ্রের এক হাজার টাকা উপার্জন হতো।

অথচ এই টাকা উপার্জনের জন্য তিনি নিজে কোন চেষ্টা করতেন না, কাউকে কোন চাপ দিতেন না। তবু রোগীরা স্বেচ্ছায় তাঁকে কিছু কিছু টাকা দিত। তাঁর সুনাম এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে অনেকে কলকাতার নামকরা ডাক্তারদের সমান ভিজিট দিয়ে তাঁর কাছে রোগ দেখাতে আসত। অনেকে তাঁকে একশত টাকা ভিজিট দিয়ে কোন দুরারোগ্য রোগ দেখাবার জন্য বাড়িতে নিয়ে যেতো। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের খ্যাতি যত বাড়তে থাকে, তাঁর কাছে রোগীর সংখ্যাও তত বেড়ে যেতে থাকে ফলে দেশে অন্যান্য যে সব ডাক্তার ছিল তাদের কাছে রোগীরা যেত না। তাদের আয় রোজগার কমে যেতে তারা অনুকূলচন্দ্রের নামে নানা কুৎসা রচনা করতে থাকে। বলতে থাকে ও ডাক্তারের

কিছু জানে না, ফকিরালী করে রোগ সারায়।

একদিন এক ডাক্তার একজন মুসলমানের কাছে অনুকূলচন্দ্রের নিন্দা করতে সেই মুসলমান লোকটি তাকে তাড়া করে এবং বলে যে ভদ্রলোক মানুষের ভাল ছাড়া মন্দ করে না। মানুষের বিপদে আপদে এসে বুক দিয়ে পড়ে। দাবী দাওয়ার ধার ধারে না। উল্টে গাঁটের পয়সা খরচ করে রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করে। তাঁর নামে যত অকথা কুকথা! এইভাবে লোকটি সেই ডাক্তারকে অপমান করে তাড়া করলে ডাক্তার পালিয়ে যায়। সেই থেকে অনুকূলচন্দ্রের নামে কোন ডাক্তার কোথাও নিন্দা করতে সাহস পেত না। উদার স্বভাব অনুকূলচন্দ্র মানুষের নিন্দা স্তুতিতে মোটেই উত্তেজিত হতেন না; একান্ত নির্বিকারভাবে সকলের সব নিন্দা অপমান সহ্য করে যেতেন তিনি।

তথাপি তাঁর দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিগণ ও সমাজের সাধারণ মানুষই তাঁর বিরুদ্ধে যে কোন নিন্দা বা কুৎসার প্রতিবাদ করতেন।

অনুকূলচন্দ্রের শৈশবে নামকরণের সময় কবিতার চারটি পঙতিতে ছন্দবদ্ধ এক উপদেশ দান করেছিলেন জননী দেবী। সেই উপদেশে তিনি বলেছিলেন—দীনহীন জন, অকূলে পড়লে মাথা নত করে তাদের কথা শুনবে এবং সাধ্যমত কূল দেবার চেষ্টা করবে তবেই তোমার অনুকূল নাম সার্থক হবে।

জননী দেবীর এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। অসংখ্য অকূলে পড়া লোকদের কূল দিয়ে তাঁর অনুকূল নাম আশ্চর্যভাবে সার্থক করে তুলেছিলেন।

একবার তাঁর ছাত্রজীবনে অর্থাৎ ঠাকুর যখন কলকাতায় ডাক্তারী পড়তেন, তখন একদিন তাঁর কাছে মাত্র ছ আনা পয়সা ছিল। কারণ এই সময় দারুণ অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন চালাতে হতো তাঁকে। সেদিন ঐ ছ আনা পয়সাতেই তাঁকে সারাদিন চালাতে হবে। এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁর কাছে আট আনা পয়সা চাইল। বলল সে খুবই বিপদে পড়েছে। উদার স্বভাব, কোমল প্রাণ অনুকূলচন্দ্র বিপন্ন আর্ত ব্যক্তিকে কোন না কোন ভাবে সাহায্য না করে থাকতে পারতেন না কখনো। বন্ধুর কথা শুনে তাঁর প্রাণ এমন করে কেঁদে উঠল যে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর মাত্র ছ আনা পয়সা বন্ধুর হাতে দিয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, এই নাও, আমার কাছে আর নেই ভাই। এতেই কোন রকমে চালিয়ে নিও।

বলা বাহুল্য সেদিন ঐ ছ আনা পয়সা বন্ধুকে দেওয়ার ফলে সারাদিন অনাহারে থাকতে হয় অনুকূলচন্দ্রকে। সেদিন তিনি শুধু রাস্তার জল খেয়ে কাটান।

৫

হিমাইতপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে রুগী দেখতে গিয়ে সেকালের গ্রামাঞ্চলের সমাজজীবন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। এই অভিজ্ঞতা ছিল বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি দেখলেন বিভিন্ন গ্রামে সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা বড়ই কম। সব গ্রামেরই বেশির ভাগ লোকই ছিল অশিক্ষিত ও গরীব। বিত্তহীন লোকেদের অনেকেরই কর্মসংস্থান ছিল না। অশিক্ষিত ও অভাব-গ্রস্ত লোকেরা চুরি ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের মধ্যে অনেকে আবার চুরি ডাকাতির উপর নির্ভর করে কোন রকমে সংসার প্রতিপালন করত। গ্রামে গ্রামে মদ্যপায়ী ও দুর্বৃত্তদের সংখ্যাও কম ছিল না।

এই সব দুর্বৃত্তেরা সারা অঞ্চলে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করে বেড়ায়। এরা শুধু চুরি ডাকাতি করতো না, এরা ছিল পূর্ণ মাত্রায় নারীলোলুপ। কোন বাড়িতে কোন সুন্দরী মেয়ে বা বধূ দেখলে তাকে তারা ছলেবলেকৌশলে হরণ করার চেষ্টা করত। ফলে চুরি ডাকাতি ও নারী হরণের ভয়ে গ্রামের গৃহস্থ লোকেরা রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পেত না।

সমাজজীবনের এই দুরবস্থা দেখে ব্যথায় কাতর হয়ে তার দূরীকরণের উপায় খুঁজতে লাগলেন সংবেদনশীল ও মহানুভব অনুকূলচন্দ্র। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ইতিমধ্যে বহু দেহের ব্যাধির চিকিৎসা করেছেন তিনি। দেহের ব্যাধিতে ভুগতে থাকা মানুষ চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে আসে। কিন্তু যে সব অসংখ্য মানুষ মনের ব্যধিতে ভুগছে তারা তো কোনদিনই তাঁর কাছে আসবে না। তাই তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন এই মনের ব্যাধি নিরাকরণের জন্য কিছু তাঁকে করতেই হবে। তা না হলে যত সদ্‌গুণই থাক, কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না তাঁর জীবন।

অনুকূলচন্দ্র দেখলেন দুর্বৃত্তদের ভয়ে বাড়ির মেয়েরা নদীতে স্নান করতে যেতে পারে না। কোন গৃহস্থ বাড়ির বউ বা মেয়ে পালকিতে করে কোথাও গেলে দুর্বৃত্তেরা সেই পালকির পিছু নিত এবং তাদের হরণ করার চেষ্টা করত। পাবনা জেলায় পদ্মার দুই তীরবর্তী অসংখ্য গ্রামে এই অবস্থা বিরাজ করত। সাধারণ মানুষ সুখ শান্তি হারিয়ে ভীতত্রস্ত অবস্থায় এক দুর্বিষহ জীবন যাপন করত।

ঠাকুর দেখলেন গ্রামে গ্রামে দুর্বৃত্তেরা এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে সন্ধ্যা হতেই রাত পর্যন্ত এক একটি নির্জন জায়গায় নিজেদের মধ্যে চুরি ডাকাতির পরিকল্পনা করত। কেউ কেউ নারী হরণের চেষ্টায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আশ্চর্যের

কথা এই যে, এই সব দুর্বৃত্তদের দেখে ক্রোধের পরিবর্তে মমতা ও এক অপরিসীম সহানুভূতি জাগত ঠাকুরের মনে। তিনি তাদের সকলকেই চিনতেন এবং তাদের অনেকের বাড়িতে রোগ চিকিৎসাও করেছেন। সাধারণত যারা শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর লোক তারা দুর্বৃত্তদের এড়িয়ে চলে এবং তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঠাকুর তাদের এড়িয়ে না গিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এক নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেন।

এই উদ্দেশ্যে ঠাকুর তাঁর ডিসপেনসারী প্রতিবেশী বসন্তকুমার সাহা চৌধুরীর বাড়ি থেকে সরিয়ে নিজের বহির্বাড়ির সামনে পদ্মার তীরে এক চারচালওয়ালা ঘরে স্থাপন করলেন এবং নিজে সেখানে বেশি সময় দিতে পারবেন না বলে সেই ডিসপেনসারীর ভার বাল্যবন্ধু ডাক্তার অনন্ত রায়ের হাতে তুলে দিলেন। সেই সময় থেকে তিনি মানুষের দেহ রোগের চিকিৎসা ছেড়ে তাদের মনোব্যাধির নিরাকরণে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োজিত করলেন। তিনি ভাবলেন, ওষুধ প্রয়োগে দেহের ব্যাধি সহজেই দূর করা যায়, কিন্তু শাসন তিরস্কার ও শুষ্ক উপদেশ বা বাধা প্রদানের দ্বারা মানুষের মনের ব্যাধি দূর করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই তিনি ভালবাসার দ্বারা সহজ সরলভাবে সেই সব দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মেলামেশা করে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তিনি কথার ছলে তাদের ঘর সংসারের সব অবস্থার কথা জেনে নিতেন এবং তারা যখনই কোন অভাব অনটন বা বিপদে পড়ত তখন তিনি পরম বন্ধুর মতো তাদের অর্থ সাহায্য করতেন এবং মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষের সৃষ্টি করে তাদের সম্মিলিত করে উপদেশ দিতেন। এই সব সম্মিলনে নিজ অর্থব্যয়ে ভাল খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা করতেন ঠাকুর। কখনও কখনও এদের নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানও করতেন। এর জন্য ঠাকুরের যারা বিরোধিতা করত তারা দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ঠাকুরের এই অবাধ মেলামেশার নিন্দা করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল নিজের স্বার্থে ঐ সব দুর্বৃত্তদের দলে ভিড়ে গেল অনুকূলচন্দ্র। কষ্ট করে ডাক্তারি না করে ও এখন চোর ডাকাতদের অর্থে ভাগ বসিয়ে বসে বসে খেতে চায়।

কিন্তু নিন্দুকেরা যে যাই বলুক, পরম দয়াময় ঠাকুরের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি একাই নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের ব্রত নিয়ে। তিনি মনে মনে তাঁর সঙ্কল্পে দৃঢ় ও অটল হয়ে রইলেন। সমাজের ঐসব পাষণ্ড দুর্বৃত্তদের সঙ্গে সহজভাবে মিশে তাদের সবাইকে ভাল করে তুললেন। তাদের ন্যায় ও নীতিবোধ সঞ্চার করে তিনি দেখিয়ে দিলেন তারাও সমাজের উপকারী বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।

এর জন্য ঠাকুরকে অনেক সময় অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। দুর্বৃত্তদের চরিত্র পরিবর্তনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন ঠাকুর তা বড় চমৎকার ও আশ্চর্যভাবে ফলপ্রদ। কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে আমরা এর পরিচয় পাই।

একদিন এক ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একদল দুর্বৃত্ত এক জায়গায় মিলিত হয়ে কোন বাড়িতে চুরি করতে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল। সহসা ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের বললেন, তোরা কোথায় যাবি, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

দুর্বৃত্তেরা বাধা দিতে চাইলেও ঠাকুর এমন আন্তরিকভাবে কথাগুলি বললেন যে, তারা অবশেষে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হলো। তারা অন্ধকারে পথ চলতে চলতে একটি বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। ঠাকুরও সেখানে দাঁড়ালেন। ঠাকুর বুঝলেন সেদিন ঐ সব দুর্বৃত্তরা একটি বাড়ি থেকে নারী হরণ করতে এসেছে। বাড়ির বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল এক স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছে। দুর্বৃত্তেরা এই মতলব করেছিল যে ঐ স্ত্রীলোকটি একবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেই তারা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা সেই ঘরের বাইরে একটি ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ঠাকুরও তাদের সঙ্গে লুকিয়ে রইলেন। কিন্তু অসংখ্য মশার কামড়ে সেখানে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ঠাকুর মনে মনে এক ফন্দি এঁটে সহসা সেখান থেকে দৌড়তে শুরু করলেন। তার দৌড় দেখে দুর্বৃত্তেরা মনে করল হয়তো ঠাকুর কোন বিপদের আভাস পেয়েছেন তাই তারাও ঠাকুরের পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগল।

অবশেষে ঠাকুর এক মাঠে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সেই সব দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে ওজস্বিনী ভাষায় বলতে লাগলেন আমরা কি পুরুষ! আমরা কি মানুষ! কেন আমরা সামান্য এক নারীর জন্য মশার কামড় খেয়ে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। কেন আমরা নারী হরণের পাপকে প্রশ্রয় দেব মনে। এ কথা কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমরা সকলেই ভদ্র সন্তান। আমরাও মানুষ। বিপন্ন নারীদের উদ্ধার করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। তা না করে কেন আমরা এক সামান্য নারীর পিছনে ছুটব। আমরা যদি শৌর্যবীর্য ও সদ্‌গুণের পরিচয় দিই তাহলে নারীরাই আমাদের শ্রদ্ধা করে আমাদের পিছনে ছুটবে।

এই বলে ঠাকুর থামলেন। তিনি যখন গম্ভীর কণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষায় এই কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর সেই কথাগুলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল সেই নৈশ নিস্তব্ধ মাঠের আদিগন্ত শূন্যতায়। দুর্বৃত্তেরা সেই কথাগুলি স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। তারা চৈতন্য ফিরে পেল। আর একটা বিষয় ভেবে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল যে ঠাকুর শিক্ষিত

সদাশয় ও একজন যশস্বী ডাক্তার হয়েও নিজেকে আজ তিনি তাদেরই দলের একজন ভাবছেন। সেই দুর্বৃত্তদের দল থেকে তিনি নিজেকে পৃথক করে দেখছেন না। দেখছেন তাদেরই একজন হিসাবে। তাই তিনি প্রতিটি বাক্যের আগে আমরা বলে শুরু করছিলেন।

এই সব ভেবে দুর্বৃত্তেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ঠাকুরের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগল আমরা আর কখনও একাজ করব না ঠাকুর, তুমি আমাদের ক্ষমা করো। আমাদের ভালোর জন্য তুমি কত কষ্ট করলে, কত বিপদের ঝুঁকি নিলে। এতে তোমার তো কোন স্বার্থ ছিল না। তুমি মানুষ নও, দেবতা।

সেদিন রাতে যখন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র দুর্বৃত্তদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ঐ সব কথা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন তখন তাঁর মনে কেবল একটা কথাই জাগছিল যে প্রকৃতি জগতে পুরুষ কত সুন্দর, কত মহীয়ান, কত গরীয়ান। পরবর্তীকালে ঠাকুর এই ঘটনার উল্লেখ করে ভক্তদের কাছে বলেছিলেন—সঙ্গীদের সাথে যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে কথা বলছিলাম, দেখতে পেলাম একটা সিংহ গম্ভীরভাবে রাজার মত বসে আছে, একটা সিংহী তার মুখের দিকে চেয়ে আছে, যেন তৃপ্ত হচ্ছে, একটা ময়ূর পেখম ধরে নৃত্য করছে, একটা ময়ূরী তাই দেখে আনন্দে মাতোয়ারা, একটা পুরুষ দোয়েল শিস দিচ্ছে, একটা স্ত্রী দোয়েল তা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে—ভাবলাম, পুরুষ কত সুন্দর! পুরুষ স্ত্রীর পিছনে ছুটবে কেন? এটা যে সত্যিই প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

একবার একটি লোক স্ত্রীলোকের প্রতি কামলোলুপতার বশবর্তী হয়ে গৃহস্থদের বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াত। সে ভাবে অনুকূলচন্দ্র হয়তো নারীকে বশ করার মন্ত্র জানে। তাই সে ঠাকুরর কাছ থেকে সেই মন্ত্র লাভ করার জন্য প্রায়ই পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ঠাকুর তখন মনে মনে এক আশ্চর্য উপায়ের কথা চিন্তা করে এক রাত্রিতে পদ্মার এক তীরে লোকটিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন এক স্তব্ধ গম্ভীর মূর্তি ধারণ করলেন। লোকটি হতভম্ব হয়ে তাঁর কাছে বসে পড়ল। ঠাকুর তখন উদাত্তকণ্ঠে মা-মা বলে মাতৃমন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। তাঁর মা-মা কণ্ঠে অমৃতবর্ষী ধ্বনিতে কলনাদিনী পদ্মার বুক, তীরবর্তী নির্জন বন ও প্রান্তর বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। সেই পরম পবিত্র মাতৃনাম শুনে লোকটির সমস্ত অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত ও তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল। লোকটি তখন ভক্তিবিগলিত চিত্তে ঠাকুরের পদতলে পতিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মা-মা-মা বলে ডাকতে লাগলো।

এইভাবে সেই রাত্রিতে ঠাকুরের কাছে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে তার চরিত্র

আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল।

ঠাকুরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এইরকম বহু দুর্বৃত্ত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিল একাজ আর কখনো তারা করবে না। ঠাকুরের পরম পবিত্র স্পর্শে তাদের সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে গেল তাদের অন্তর থেকে। তারা হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, অন্য মন।

বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সমাজবিরোধী ও দুর্বৃত্তদের চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল গ্রামবাসীরা। একদিন যারা যে মুখে ঠাকুরের নিন্দা করত আজ তারা সেই মুখেই তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। এখন আর রাত্রিকালে ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় না শান্তিপ্রিয় নিরীহ গৃহস্থদের। চুরি ডাকাতি ও নারী হরণের ঘটনা কমে গেল একেবারে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দৈহিক বা মানসিক রোগ নিরাকরণের পিছনে যে আশ্চর্য শক্তি কাজ করত তার উৎস ছিল নিরন্তর নাম জপ। শৈশব থেকেই সকলের অলক্ষ্যে ও অগোচরে আপন মনে নাম জপ করে যেতেন তিনি। আর সেই নাম জপ থেকেই এক অপার আনন্দের সঙ্গে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তি লাভ করতেন। আর তার ফলে কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন না তিনি। বরং আপন মনোবলে সেই অবস্থাকে নিজের অনুকূলে আনতেন ধীরে ধীরে।

নিরন্তর নাম জপ করার ফলে নিতান্ত বাল্যকালেই কতকগুলি ভাববিকার দেখা যেত। কখনো কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন এবং কখনো এক দিব্য জ্যোতি ও দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করতেন। তাঁর অঙ্গস্পর্শে যে কোন মানুষ ও বৃক্ষপল্লবের মধ্যে এক অপূর্ব শিহরণ জাগত। তাঁর কর্মশক্তি ও মনোবল প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যেত।

কারোর কাছ থেকে দীক্ষা না নিয়েও যে নাম অনবরত জপ করতেন তা তিনি কোথায় পেলেন জানতেন না। যাই হোক তাঁর এই ভাববিকার দেখে নানা লোকে নানা কথা বলত, কেউ তাঁর জননীদেবীকে বলত, তোমার ছেলে পাগল হয়ে যাবে। কেউ বলত ওকে ভূতে পেয়েছে।

এই সব কথা শুনে মাতা মনোমোহিনীদেবী চিন্তিত হয়ে গাজীপুরে তাঁর গুরুদেব হুজু মহারাজের রাধাস্বামী মতের তৎকালীন জীবন্ত চতুর্থ সদগুরু বাবু কামতাপ্রসাদের (সরকার সাহেব) নিকট একটি পত্রে পুত্র অনুকূলের ভাববিকারের কথা সব জানালেন। এই পত্রের উত্তরে গুরুদেব সরকার সাহেব জানালেন, তোমার ছেলে পাগল হয়নি বা তাকে ভূতে পায়নি। এই ভাববিকার উচ্চস্তরের সাধকদেরই হয়ে থাকে। এটা তার উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির লক্ষণ। যাই হোক তুমি তাকে সৎ নামে দীক্ষা দেবে

অবিলম্বে।

এই নির্দেশ পেয়ে মনোমোহিনীদেবী একদিন বালক বয়সে অনুকূলকে দীক্ষাদান করেন। দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে অজ্ঞান হয়ে পড়েন অনুকূলচন্দ্র। পরে তিনি মাকে বলেন, এ নাম তো আমি বারবারই করে থাকি।

মনোমোহিনীদেবী আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ নাম তুই কোথায় পেলি?

অনুকূলচন্দ্র উত্তরে বললেন, সে আমি জানি না মা। তবে জন্মাবধি আমি এই নামই করে আসছি। নামধ্যান সংক্রান্ত তাঁর সকল অবস্থা ও অনুভূতির কথাও সবিস্তারে মাতৃদেবীর কাছে সরল ভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র বিদুষী সাধিকা মনোমোহিনীদেবী বালক অনুকূলচন্দ্রের সমস্ত কথা শুনে বুঝতে পারলেন, ষটচক্র ভেদ থেকে শুরু করে ওঁকার ও ওঁকারের পরবর্তী সত্য লোক, অগম্য লোক, অনামী লোক, প্রভৃতি অধ্যাত্ম জগতের অত্যুচ্চ ধামসমূহের জ্ঞান আগেই লাভ করেছেন। অর্থাৎ যোগীরা দীর্ঘ যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধি লাভ করেন, বালক সেই সিদ্ধি শুধু নাম জপের মধ্য দিয়েই লাভ করেছে।

এরপর থেকে প্রায়ই অনুকূলচন্দ্র সরকার সাহেবের অনুরূপ কম শ্রুতবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষকে দর্শন করতেন মানসচক্ষে।

শৈশব থেকে তার যে নাম জপের আভাস ছিল, সে অভ্যাস বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সৎ নামের অদ্ভুত ক্ষমতাও উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে লাভ করতে থাকে।

এই ক্ষমতাবলেই তরুণ চিকিৎসক অনুকূলচন্দ্র মানুষের দুরারোগ্য দেহের ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বদ্ধমূল মনের ব্যাধিরও সহজেই নিরাকরণ করতে সমর্থ হন।

এই নিরন্তর নাম জপের ফলে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এমনই অবস্থা হয় যে, তিনি যখনই যা কিছুতে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করতেন তখনই তিনি তাই হয়ে যেতেন। যদি তিনি কখনো কোন বৃক্ষের প্রতি গভীরভাবে মন দিতেন তখন তাঁর মনে হতো তিনি সেই বৃক্ষ হয়ে গেছেন এবং মাটির গভীর থেকে রস গ্রহণ ও পত্রের মাধ্যমে সূর্যালোক থেকে খাদ্য গ্রহণ করছেন।

একদিন ঠাকুর দেখলেন, মাঠে এক শকুন একটি মরা গরুর পচা মাংস খাচ্ছে। সেই শকুনের প্রতি গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করতেই তিনি শকুনভাব প্রাপ্ত হলেন

এবং সেই সঙ্গে পচা গো মাংসের স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। কোন পশু বা জীবের দুরবস্থা দেখলেই তিনি আত্মহারা হয়ে সেই অবস্থা নিজের মধ্যে অনুভব করতেন।

একদিন এক শিকারী দুটি পাখীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে ঠাকুর বাড়িতে থেকে গুলির শব্দ শুনে নিজের বুকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে কাতর ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

একবার চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বাড়ির অদূরে এক তান্ত্রিক এক ছাগ শিশুর বলি দেবার উদ্যোগ করতেই ঠাকুর সেখানে গিয়ে ছাগশিশুটিকে ছেড়ে দেবার জন্য তান্ত্রিককে অনেক অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু তান্ত্রিক তা না করে তাঁকে গালি দিতে থাকে। তখন মাতা মনোমোহিনীদেবী বাড়ির ভৃত্য নফরচন্দ্রের সাহায্যে সেই ছাগশিশুটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। ঠাকুর তখন পরম স্নেহভরে ছাগশিশুটিকে জড়িয়ে ধরে বারবার তার মুখ চুম্বন করতে থাকেন।

একবার কয়েকজন পার্ষদের সঙ্গে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কোথায় যাচ্ছিলেন। পথে যেতে যেতে এক সময় অশ্বদের গতিবেগ বাড়ানোর জন্য গাড়োয়ান তাদের পিঠে জোরে চাবুক মারে। সেই চাবুকের শব্দে কাতর হয়ে অনুকূলচন্দ্র চিৎকার করে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পার্ষদরা গাড়ি থামিয়ে নিচে নেমে দেখলেন ঘোড়ার পিঠে চাবুকের যে দাগ সেই দাগ অনুকূলচন্দ্রের পিঠে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই রকম আশ্চর্য ঘটনা কেউ কখনো আগে দেখেনি। গভীর আত্মসংযোগের ফলেই পশুর পিঠে মারা চাবুকের দাগ অনুকূলচন্দ্রের পিঠে স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

কেউ কখনো কোন গাছের পাতা ছিঁড়লে বা ডালপালা কাটলে তা দেখে যন্ত্রণায় ছটফট করতেন অনুকূলচন্দ্র। এইভাবে দেখা যায় শুধু মানুষ বা কোন জীব নয়। প্রকৃতি-জগতে যে কোন বস্তুর সঙ্গে তিনি ছিলেন একাত্ম। তাই অভিন্ন অচ্ছেদ্য এক আত্মিক বন্ধনে এই বিশ্বজগতের সবকিছুর সঙ্গে তিনি ছিলেন আবদ্ধ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইষ্টপ্রাণতা ও নামজপের ফলে বিশ্বভাবনার গভীর থেকে গভীরতর স্তরে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ ও মূল সত্ত্বাটি এক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বের বিচিত্র বস্তু সেই একেরই অভিব্যক্তি। সেই এক পরম সত্ত্বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতে বিরাজমান থেকে সবকিছু পরিচালনা করছেন। এই পরম সত্যের অনুভূতি ও নিবিড়তম উপলব্ধি তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যায় যে, জল-স্থল আকাশ বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তু প্রকৃতি বিশ্বের সবকিছুকেই আপন আত্মার মত মনে করতেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজেই যেন সবকিছু হয়ে গেছেন, এরূপ বোধ

করতেন। এইভাবে সব ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর মধ্যে।

ইষ্টপ্রাণতা ও সৎ নামজপ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ঈশ্বরপ্রাপ্তির নেশায় ঠাকুরকে এমনই পাগল করে তুলল যে ঈশ্বরের ধ্যানে তিনি প্রায়ই বিভোর হয়ে থাকতেন। লুপ্ত হয়ে যেত তাঁর বাহ্যজ্ঞান। মাঝে মাঝে প্রাণের আবেগে ও আকুতিতে পরমপিতাকে আর্তস্বরে ডাকতেন। দেখে মনে হতো তিনি যেন তাঁর কোন প্রিয়জনকে ডাকছেন। বিভিন্ন সময়ে কখনো পরমপিতাকে পাওয়ার আনন্দে আবার কখনো না-পাওয়ার বেদনায় দুই-ই শিশুর মত সরল ভাবে প্রকাশ করতেন।

এদিকে বাস্তব জীবনে আপন আত্মার মধ্যে বিশ্বের সবকিছুকে দেখা এবং বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে আপন আত্মাকে দেখার নেশাও পেয়ে বসল তাঁকে। এক-একদিন অন্নভোজনের সময় মনে হতো এই অন্ন কি আমার থেকে পৃথক? এই অন্নের মধ্যেও তো আমি আছি। সুতরাং কে কাকে খাচ্ছে?

এই কথা ভাবতে ভাবতে ভোজন না করেই উঠে যেতেন ঠাকুর।

আবার কোন শোক দুঃখ উপস্থিত হলে তিনি ভাবতেন এই শোক দুঃখ তো পরম-পিতারই দেওয়া। যে বুকের আধারে আমরা শোক দুঃখ অনুভব করি সে আধারও তো তাঁরই দেওয়া। আবার দুঃখ অনুভব করবার শক্তিও তাঁরই দেওয়া। তাছাড়া আমাদের এই মর্ত্য জীবনও তাঁরই দান। সুতরাং কী সুখ, কী দুঃখ, কী শোক, কী তাপ, সব কিছুকে সেই পরমপিতার দান হিসাবে গ্রহণ করে সবকিছুতে অবিচলিত থাকতেন ঠাকুর। সমস্ত সুখ দুঃখকে আপন আত্মার মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়ে পরমপিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে এক পরমানন্দে আপ্লুত হয়ে উঠত তাঁর সমস্ত অন্তর। এক নিবিড়তম ভক্তিতে বিগলিত হয়ে উঠত তাঁর সমস্ত চিত্ত।

এক এক সময় পরমপিতার জন্য বিরহ বেদনায় আকুল হয়ে উঠতেন তিনি। আবার পরক্ষণেই ভাবতেন পরমপিতা ও আমি কি আলাদা? তিনি তো সর্বক্ষণ আমার মধ্যেই বিরাজিত আছেন। তিনি আরো ভাবতেন আমরা যখন নিজেদের পরম-পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি, তখনই যত সব দুঃখ জাগে আমাদের মধ্যে। মানুষ যখন পরমপিতা অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে তার আত্মাকে যুক্ত করে দেখে তখন সে বিশ্ব-জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যে পরমপিতা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সদাসর্বদা বিরাজমান, সেই পরমপিতার সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানেই তো সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ও একাত্ম হয়ে ওঠা।

ঠাকুর এই সময় পরমপিতার উদ্দেশ্যে তাঁর ভক্তহৃদয়ের গভীর আবেগ তাঁর রচিত কয়েকটি সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ করেন। ভক্তিরসাত্মক এই সব গানগুলির মধ্যে

একটি হলো

নেচে নেচে চল দেখি ভাই ডাকেন পিতা আকুল প্রাণে।
চল্‌চল্‌ হৃদয় জুড়াই পরমপিতার আলিঙ্গনে
অনুতাপ আকুল একমনে
ডাকি আয় হৃদয়রঞ্জনে
শোকতাপ ব্যথা যাবে দূরে তার প্রেম-পরশনে।।

এক উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও ভক্তিরসাত্মক আবেগানুভূতি ছাড়া এ গান রচনা করা যায় না। যে পরমপিতার প্রেমময় স্পর্শে হৃদয়ের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায় সেই পরমপিতার ডাক আলোড়িত করেছে তাঁর অন্তরের অন্তস্তল। এ ডাক সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছায় না কখনো। এই পরম ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে পরমানন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে আনন্দ কখনো একটি অন্তরের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। অন্তর উপচে পড়ে সেই আনন্দধারাকে আর পাঁচজনের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য এমনি করে আকুল ভাবে ডাকতে হয়।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঠাকুরের রচিত একটি গানের পদে পাওয়া যায়—

কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন।
কোথায় গিয়ে লুকালে নাথ হরে নিয়ে প্রাণমন।।
কৃষ্ণবিনা এ সংসার
সবই দেখি অন্ধকার
কে আমার আমি কার যেন নিশার স্বপন।।
যেদিকে মেলি আঁখি
কৃষ্ণ কর লেখা দেখি
উর্ধ্ববাহু হয়ে থাকি দেহ না দরশন।।
দীনহীন কিশোর দাস
করে কৃষ্ণ তব আশ
কর পাপের বিনাশ ঘুচাও জীববন্ধন।।
মুক্তকর সকল প্রাণী
তোমার চরণে আনি
লয়ে আমার প্রাণ পাপীতাপীর কর ত্রাণ।।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অধ্যাত্মসাধনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণবিষয়ক পদটির এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি যে পরমপিতার সাধনা করছেন সে পিতা কখনো নিরাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর

হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই সাকার, কারণ তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বা পিতা। তাই মনে হয় পরমপুরুষ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম কৃষ্ণকে পরমপিতার সঙ্গে এক করে দেখতেন ঠাকুর। কিন্তু ঠাকুরের এই কৃষ্ণভজনা বৈষ্ণবদের কৃষ্ণসাধনা থেকে পৃথক। বৈষ্ণবদের মতো দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সব ভাব ও রসের কোনটিকে অবলম্বন করে উৎসারিত হয়নি ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি। ঠাকুর কৃষ্ণকে কখনো আপন প্রভু, সখা, সন্তান বা প্রেমাস্পদ হিসাবে দেখেননি। তাঁর কাছে কৃষ্ণ একই সঙ্গে মাতা-পিতা ও প্রাণের ধন। যাকে কোন এক বিশেষ সম্পর্কের দ্বারা বন্ধন করা যায় না। সকল জাগতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকেও তিনি একাধারে আমাদের মাতা-পিতা ও অতি উচ্চস্তরের এক প্রেমাস্পদ। যিনি আমাদের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে বিরাজ করছেন। এই কৃষ্ণই তাঁর কাছে একমাত্র পরমার্থ বা পরমপুরুষার্থ। আবার এই কৃষ্ণই তাঁর প্রাণের ধন। যে ধন একবার পেলে আর কিছু চাইতে হয় না। এই কৃষ্ণকে জ্ঞান দ্বারা জানা যায় বটে, কিন্তু প্রেম ভক্তি ছাড়া লাভ করা যায় না।

ঠাকুর পরবর্তীকালে তাঁর বাল্যকাল থেকে যে সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল, সেই সব অনুভূতির কথা নিজে অনেক সময় কথাপ্রসঙ্গে বর্ণনা করে গেছেন। ঠাকুর বলেছেন, আমি ছোটবেলায় সব সময় নামময় হয়ে থাকতাম। দিনরাতই নাম করতাম। কিন্তু আসনাদি করে নাম ধ্যান কখনো করিনি। নাম করতে ভাল লাগতো তাই করতাম। একবার নাম করতে করতে দেখি প্রকাণ্ড সূর্যের মতো জ্বলন্ত গোলাকার পদার্থ আমার সম্মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখতাম শত সহস্র চন্দ্র সূর্য আমার চারদিকে ঘুরছে, আর শব্দ করছে, যেন সহস্র সহস্র ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের একসঙ্গে শব্দ হচ্ছে। নাম করতে করতে মাঝে মাঝে মনে হতো প্রাণ যায় কিন্তু তবু নাম করা ছাড়িনি। যখন খুব কষ্ট হতো তখন কাতরকণ্ঠে 'মা-মা' বলে ডাকতাম আর কালী মূর্তি এসে হাজির হতো। স্নেহের হাত বুলিয়ে দিত গায়। একবার বিষ্ণু মূর্তিও দেখেছিলাম।

একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। আমার খুব পিপাসা পেল। একজন সবাইকে জল দিচ্ছিল কিন্তু আমাকে দিল না। তখন আমার বড় রাগ ও দুঃখ হলো। রামকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করলাম। দেখে তাঁকে খুব পরিচিত মনে হলো। হয়তো আগে শোনার জন্য তা মনে হতে পারে। তারপর পঞ্চবটীর তলায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। দেখলাম মা কালী আসছেন। কালো তবু বড় Soothing জপ। কাছে এসে বসে আমার মাথাটা তুলে নিয়ে তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন। তাঁর স্পর্শে আমি কেমন হয়ে গেলাম। কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না। আদর করে বললেন, তুই

সবার সামনে চাইলে কি আমি দিতে পারি? লক্ষ্মীটি এইগুলো খেয়ে নে, দেখলাম সোনার মত উজ্জ্বল থালায় লুচি, বরফীর মতো সন্দেশ ইত্যাদি রয়েছে। তিনি আমাকে সেগুলি নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন, খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম। এমন সময় কে এসে আমায় ডাকল, আমি জেগে উঠে দেখলাম আমার আর কোন ক্ষুধা পিপাসা নেই।

একদিন একটি বড় যাঁতা বয়ে আনছিলাম। আমার মত বয়সের ছেলের পক্ষে অত ভারী যাঁতা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছিল। হাত, পিঠ ও বুকের শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। এমন সময় দেখলাম কালী-মা হাত বাড়িয়ে যাঁতাটা ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন। যাঁতা বইতে তখন আর আমার কোন কষ্ট হচ্ছিল না।

একদিন আমি কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছিলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে আমার হাত থেকে কুড়ুল নিয়ে নিজেই তা কেটে দিয়ে চলে গেলেন। এগুলো সাধারণ চোখেই দেখেছি। বাইরের জিনিসগুলো যেমন দেখি, এগুলোও ঠিক সেই রকমই দেখেছি।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার তাৎপর্য এই যে, ঠাকুর প্রথাগতভাবে যোগসাধনা না করলেও তিনি ছিলেন গুপ্ত যোগী। নিরন্তর নাম জপের ফলে তাঁর ইষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরমপিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই দেবদেবীদের স্নেহ ভালবাসা তিনি অযাচিত ভাবেই লাভ করেছেন বারবার।

সাধারণ মানুষের কাছে ঠাকুরের এই সব অভিজ্ঞতা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ ঠাকুরের কাছে এগুলি ছিল এক একটি বাস্তব ঘটনা।

৭

রোগচিকিৎসার সুযোগে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে বহু গ্রামের বহু মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। মানবপ্রেম ও সমাজসেবা তাঁর চরিত্রের এই প্রধান গুণ দুটি প্রথম যৌবনেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর মধ্যে। উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা লাভের আগে থেকে মানুষের সঙ্গলাভ করতে ও তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইতেন তিনি। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সব মানুষকেই অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন তিনি। বুকভরা ভালবাসা দিয়ে সব মানুষকেই কাছে টেনে আনতে চাইতেন তিনি। মানুষকে ভালবেসে তিনি সুখ পেতেন, আবার তাদের কোন না কোন উপকার বা কোনভাবে সাহায্য করে আরো সুখ পেতেন তিনি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু লোকের দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি দূরীকরণের কাজ

করতে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই গরীব এবং অভাব-অনটন ও অর্থকষ্টে অতিশয় পীড়িত। এটা তাঁর পক্ষে দুঃখজনক হলেও তিনি আরও দুঃখ পেলেন তাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন দেখে। তিনি দেখলেন সমাজের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে দয়ামায়া, মানবপ্রীতি, পরোপকার প্রবৃত্তি প্রভৃতি কোন সদ্ গুণই তাদের চরিত্রে নেই। সে চরিত্রে আছে শুধু হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পাপপ্রবৃত্তির প্রবলতা।

ঠাকুর দেখলেন, মানুষ তার জীবনে একটি উচ্চ ভাবাদর্শকে অবলম্বন করতে না পারলে তার নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত করা কখনই সম্ভব হবে না। পৃথিবী যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে তার কক্ষপথে আবর্তিত হয় তেমনি প্রতিটি মানুষের উচিত এক উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলবে এবং সে তার জীবনপথে আবর্তিত হবে।

তিনি দেখলেন মানুষের মন থেকে যতসব অসৎ প্রবৃত্তি দূর করে তাকে সৎ চরিত্র করে তুলতে হলে তাকে ভগবৎ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। অটল অবিচলিত ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে তার মধ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরিনাম সংকীর্তনের আদর্শটিকে সমাজজীবনের মধ্যে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠলেন ঠাকুর। তিনি দেখলেন হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠানে বহু লোককে এক জায়গায় মিলিত করে তাদের মনকে ভগবৎ প্রেমে মত্ত করে তুলতে পারলেই এক উচ্চ আদর্শকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে তাদের মন। হরিনামের এমনই গুণ যে এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নামকারীর সব পাপ হরণ করে, তার সব অমঙ্গল দূর করে। নামকারীর অজ্ঞাতসারেই হরিনাম ভগবানের চরণে তার মনকে আকর্ষণ করে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র গ্রামবাসীদের সকলের সঙ্গেই প্রাণ খুলে সরল অন্তঃকরণে মিশতেন এবং সকলের সুখদুঃখের খবর নিতেন। সাধ্যমত অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতেন। এজন্য গ্রামবাসীরাও উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে ভালবাসত এবং তাঁর সঙ্গসুখের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত সর্বদা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র গ্রামের সাধারণ লোকদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ধর্মকথা আলোচনা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, ঠাকুর হরনাথের কৃষ্ণলীলা, 'কুমারনাথের গীতা', এবং গুরু নানক, কবীর সাহেব, শ্রীচৈতন্য, হুজুর মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষের বাণী ও জীবনকথা আলোচনা করতেন।

সৎনাম ও সৎসঙ্গের প্রভাব মানুষের চরিত্রে কী ভাবে আমূল পরিবর্তন আনে সে বিষয়ে ঠাকুর একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মা কবীর সাহেবের জীবনের একটি

ঘটনাকে বিবৃত করেন।

কবীর ছিলেন জোলার ছেলে। তিনি তাঁর সাধনায় এত উন্নত হয়েছিলেন এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে এমনভাবে ভালবাসতেন যে, গ্রামের সব লোকেরা ব্রাহ্মণদের সম্মান না করে কবীরের পায়ে এসে পড়ে থাকত। এতে ব্রাহ্মণেরা কবীরের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করতে থাকে। একদিন এই সব ব্রাহ্মণেরা মিলে একজন বেশ্যাকে এই বলে রাজী করায় যে, কবীর যখন হাটে কাপড় বেচতে আসবে তখন সে যেন তাকে বলে, তুমি আমাকে বিয়ে করে চলে এসেছ, অথচ আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করনি। যদি তুমি তা না কর আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। এই কথা শুনে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা নানাভাবে উপহাস করতে লাগল। তাকে ধিক্কার দিতে লাগল।

মানবপ্রেমিক মহাসাধক কবীর সাহেব বেশ্যার এই কথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। কিছুক্ষণ তিনি বেশ্যার দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে থাকার পর প্রসন্ন মুখে শান্ত ভাবে বললেন, মা আপনার কথা তো কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি জীবনে কখনো কাউকে বিয়ে করিনি। তবু আপনি যখন বলছেন আমি অবশ্যই আপনার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দেব। এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন কবীর। এরপর সারাদিনের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় তিনি বেশ্যার কাছে গিয়ে বললেন, মা, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো। আমি যথাসাধ্য তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কবীরের এই মহান আচরণ দেখে বেশ্যা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। একজন নিষ্পাপ মানুষকে সকলের সামনে অকারণে অপমান করেছে, এই ভেবে অনুতাপের আগুনে জ্বলতে লাগল সে, সে তখন কবীর সাহেবের পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ঠাকুর আমার মত মহাপাপী আর কেউ নেই, আপনি দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।

কবীর তখন সৎনামে দীক্ষিত করে তাকে আশ্রয় দান করলেন। এই ভাবে কবীরের দয়ায় সেই পতিতা নারী উদ্ধার পেল।

ঠাকুর এবার গুরু নানক সাহেব ও গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী ও কর্মপন্থা আলোচনা করে শোনালেন। হরনাথ ঠাকুরের উপদেশ বাণীও পড়ে শোনালেন। এরপর একে একে সত্য যুগের পরাবেদ ও পরামুক্তি নারায়ণ, ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র, দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ ও কলিযুগের তারক ব্রহ্ম নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্বগুলি সকলকে সরল

ভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

যুগোপযোগী সদগুরু ও সৎনাম গ্রহণই যে মানবের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং নাম ও নামীতে যে কোন ভেদ নেই—তা সকলকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন তিনি।

এরপর ঠাকুর শ্রীবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজি মহারাজ প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষ এই কলিযুগে এসেছেন, তাঁদের গুণকীর্তন করলেন এবং এঁরা জগতে এসে মানুষের যে কত মঙ্গল করেছেন সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, মানুষ হয়ে যুগে যুগে ভগবান পৃথিবীতে আসেন। যখনই এই ধারায় ধর্মহানি হওয়ায় পাপ বৃদ্ধি পায়, আর মানুষ ধ্বংসের দিকে যায়, তখনই আদি শক্তি ধরে মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা সাধুদের পরিত্রাণ করেন এবং পাপীদের উদ্ধার করেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবৎ চেতনা ও ভগবৎ প্রেম জাগাবার জন্য ঠাকুর সমবেত ভাবে হরিনাম সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। একসঙ্গে অনেক মানুষ হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে ভগবত প্রেমে মত্ত হয়ে উঠত। ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম প্রেম ভাব কাজের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে ও নৃত্যের প্রতিটি ছন্দে রূপায়িত হয়ে উঠত। ঠাকুর নিজেও এই কীর্তনানুষ্ঠানে আনন্দের সঙ্গে যোগদান করতেন অনেক সময় হিন্দু ও মুসলমান ভক্তগণ একসঙ্গে এই সব সংকীর্তনে যোগদান করত।

ঠাকুরের এই কীর্তনলীলা যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন।

একদিন ঠাকুরের জননীদেবী এই কীর্তন স্বচক্ষে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। সেদিন সকালে কীর্তন শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত চলছিল। বেলা যত বাড়তে থাকে, কীর্তনের বেগও ততই বেড়ে চলে। অবশেষে তা ভীষণ আকার ধারণ করে। সঙ্গী ও অনুচরবর্গের সঙ্গে ঠাকুর এই কীর্তনে মত্ত হয়ে আছেন। দুপুরের প্রখর রোদের তাপে তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে অবিরল ধারায় ঘাম ঝরছে। ভাবাবেশে তাঁর বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়েছে। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কতক্ষণ যে কীর্তন চলবে তা কেউ বলতে পারে না। এদিকে ঠাকুরের স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি। একথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন মনোমোহিনীদেবী। বহুক্ষণ আগে রান্না শেষ হয়েছে। ডাল ভাত তরকারী সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের খাওয়া না হওয়ায় বাড়ির অন্য সবাই অভুক্ত। সকলেই তার জন্য অপেক্ষা করছে। মনোমোহিনীদেবী ভাবলেন এইভাবে কীর্তন করতে করতে ঠাকুরের যদি ভাবসমাধি হয় তাহলে সে সমাধিভঙ্গ হতে আরো কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে।

তাই এই কীর্তন কীভাবে থামানো যায়, মনে মনে তারই উপায় খুঁজতে লাগলেন মনোমোহিনীদেবী। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। তখন তিনি বাড়ির ভৃত্য নফরচন্দ্রকে দু-এক কলসী জল এনে কীর্তনস্থলে ঢেলে দিতে বললেন।

নফরচন্দ্র তাই করলে কীর্তনের জায়গাটা জলে পিচ্ছিল হয়ে গেল। কীর্তনীয়ারা নৃত্য করতে গিয়ে প্রায়ই পা পিছলে পড়ে যেতে লাগল। তখন তারা আর কীর্তন করতে পারল না। তাদের ভাবের নেশা কেটে গেলে কীর্তনের বেগ একেবারে কমে গেল। ঠাকুরও বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। এবার নিশ্চিন্ত হলেন মনোমোহিনীদেবী।

সতীশচন্দ্র গোস্বামী একবার ঠাকুরের কীর্তনলীলা ও ভাবসমাধি স্বচক্ষে দেখেন এবং পরে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত করেন। একবার যৌবনে ঠাকুরের সঙ্গে আমার মাঝিপাড়া গ্রামে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন আমাকে কিশোরীমোহনের কীর্তন শোনাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। নানা দেশ ভ্রমণের পর আমি বাড়ি ফেরার সময় বাজিতপুরের স্টেশন ঘাটে নামি। স্টীমার থেকে নামা মাত্র আমার শিষ্য মকুন্দচন্দ্র ঘোষ আমাকে বললেন, আপনাকে যথাশীঘ্র কিশোরীবাবার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য ঠাকুর আমাকে পাঠালেন।

একথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এতদিন পর আমি আজই বাড়ি ফিরব এবং এই বাজিতপুর ঘাটে নামব একথা ঠাকুর জানলেন কীভাবে? তবে কি তিনি অন্তর্যামী বা সর্বজ্ঞ?

যাই হোক আমি মকুন্দের সঙ্গে কিশোরীমোহনের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে কীর্তনের শব্দ শুনতে পেলাম। তখন কীর্তনে একটি গৌর বিষয়ক পদ গাওয়া হচ্ছিল।

এস গৌরাঙ্গ নদীয়ার চাঁদ হে—
তুমি আসিলে আনন্দ হবে
তুমি এস হে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘন হয়ে উঠছে। বাড়ির আঙিনায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম ঠাকুর কীর্তনঘরে বসে আছে। ঘরের মধ্যে তখনও আলো জ্বালানো না হলেও ঠাকুরের অঙ্গচ্ছটায় সমস্ত ঘরখানি আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই ঘরের মধ্যেই কীর্তন হচ্ছিল। আমি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঠাকুর আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বসালেন। ঠাকুরের সঙ্গে

আমিও একমনে কীর্তন শুনতে লাগলাম। কিশোরীমোহন তখন গান ধরলেন,

শ্যাম গরবে গরবিনী রাধা।

কিশোরীমোহনের কণ্ঠ সত্যিই বড় মধুর।

নিবিষ্ট মনে কীর্তন শুনতে শুনতে হঠাৎ আমাকে নিয়ে ঠাকুর ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তখন কীর্তনীয়ারাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আঙিনায় কীর্তন করতে লাগলেন। ঠাকুরও তখন সেই কীর্তনে যোগ দিলেন। তিনি আমাকে কীর্তনদলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমার হাত ধরে ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। সে কি অপূর্ব নৃত্য। কিশোরীমোহন তখন দু হাত তুলে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করলেন। তুমুল বেগে কীর্তন চলতে লাগল। ভাববিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে করতে ঠাকুর হঠাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মাটির উপর পড়ে গেলেন। ভক্তগণ তখন ধরাধরি করে ঠাকুরকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে মেঝের উপর শুইয়ে দিল। বুঝলাম তাঁর দেহের মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্নমাত্র নেই। তাঁর দেহখানি নিশ্চল ও নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে আছে। তখন সকলে বুঝতে পারল ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়েছে। তাই তাঁর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সকলে তখন তন্ময় চিত্তে কীর্তন করতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুকাল নিস্পন্দভাবে শুয়ে থাকার পর ঠাকুরের ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি দ্রুতবেগে কাঁপতে লাগল। তখন হাত ও পায়ের চারটি বৃদ্ধাঙ্গুলিই এইভাবে কাঁপতে লাগল। নিথর নিস্পন্দ দেহের মধ্যে কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিগুলির এইরূপ কম্পন এক আশ্চর্য ঘটনা। যাই হোক কিছুক্ষণ এইরূপ কম্পনের পর একেবারেই তা থেমে গেল। এরপর নানা রকমের আসন-প্রক্রিয়া চলতে লাগল তাঁর দেহে। সম্পূর্ণ অচেতন এক দেহে নানা রকমের এই সব আসন- প্রক্রিয়াও এক বিস্ময়কর ঘটনা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারূপ সঞ্চালন ও বিন্যাসে কতরকমের আসন যে তিনি করলেন তা বলবার নয়। এই সব আসন শেষ হবার পর তাঁর দেহটি আবার পূর্বের মতো নিথর নিশ্চল হয়ে মাটির উপর পড়ে রইল।

এইরূপে মৃতবৎ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে উচ্চস্তরের ভাবপূর্ণ বাণী অনবরত উচ্চারিত হতে লাগল। এক হতচেতন মানুষের মুখ থেকে নির্গত এমন অপরূপ তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বাণী আমি কখনো শুনিনি। আমি কেন আমাদের মধ্যে কেউ কখনো শোনেনি।

এইভাবে কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে বাণী নির্গত হবার পর তাঁর দেহে ক্রমশ প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তখন তিনি জল চাইলেন, তিনি বললেন, গোঁসাই-এর হাতে পদ্মার জল খাব।

ঠাকুরের মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে গিয়ে পদ্মায় ডুব দিয়ে এক ঘটি জল এনে তাঁকে দিলাম। তিনি প্রাণ ভরে জল পান করে কিছুটা সুস্থ হলেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তিনি সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

কিশোরীমোহন দাস বৈষ্ণব মহাশয় ঠাকুরের এই কীর্তলীলা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার সাধনঘরে রোজই প্রায় কীর্তন হতো। ঠাকুর নিয়মিত এসে সে কীর্তনে যোগ দিতেন। রাত্রে অধিক লোক সমাগম হতো। কীর্তন শেষ করে গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। কীর্তনে মত্ত হয়ে ঠাকুর যে অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য করতেন তা ভাষায় বর্ণনা করার শক্তি কারুর নেই। কীর্তনকালে কোন কোন দিন তাঁর দেহ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বেরুতো, কখনও কখনও লোমকূপ থেকে রক্তবিন্দু ঝরতো, কখনও বা পিচকারীর ধারার মতো রক্ত বার হতো।

কীর্তনদলের লোকসংখ্যার অনুপাতে আমাদের ঘরখানি ছিল নেহাতই ছোট, কিন্তু কীর্তনের সময় মনে হতো ঘরের আয়তন যেন কত বেড়ে গেছে, আমরা বহু লোক, কাজেই অনায়াসে উদ্দাম নৃত্যে তুমুল কীর্তন চালাতাম। কীর্তনঘরের পাশে কতকগুলো বড় বড় আমগাছ ছিল। কীর্তন যখন খুব জমে উঠতো, নামের জোরে গাছের ডালপালাগুলো ঘরের চালের উপর পড়ে প্রবল বেগে আছাড় খেত। মনে হতো বাইরে বুঝি ঝড় বইছে, কখনও কখনও চোখে পড়তো জ্যোতির্ময় পুরুষেরা নেচে নেচে কীর্তনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুরের ভাবে তন্ময় হয়ে যেদিন আমরা কীর্তনে খুব মেতে উঠতাম তখনই এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতো। সে সব কথা বললে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

মকুন্দচন্দ্র ঘোষ বলেন, ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের সঙ্গে কত কীর্তন করেছি। তাঁর ভাবসমাধিও কতবার দেখেছি। একদিন তরণী, কোকন, যদুপাল, হারানমিস্ত্রী ও আমি পদ্মার পারে বসে হাততালি দিয়ে হরিনাম করছি, এমন সময় ঠাকুর ও ডাক্তার কিশোরীমোহন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ রে তোরা তো বেশ নাম কীর্তন করছিস! আচ্ছা আমি যদি গান তৈরী করে দিই, তবে তোরা সুর দিয়ে গাইতে পারবি তো?

আমরা বললাম, হ্যাঁ আমাদের মত করে সুর দিয়ে গাইতে পারবো।

পরের দিন বিকেলবেলা ঠাকুর তাঁর রচিত গান নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, এই নে, তোদের জন্য গান লিখে এনেছি, সুর করে গাইবি। আমরা তখন খুব আনন্দের সঙ্গে সেই লেখাটা নিয়ে গেলাম এবং দু-তিন দিনে মুখস্থ করে সুর দিয়ে গাইতে লাগলাম।

এরপর একদিন নদীর ধারে ঐরকম হাততালি দিয়ে সেই গান গাইছি, এমন সময় ঠাকুর কিশোরীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলেন ও আমাদের গান শুনে খুশি হয়ে বললেন, বাঃ বেশ গেয়েছিস তো! বেশ সুন্দর হয়েছে। বিনা যন্ত্রে এমন গেয়েছিস তাতেই প্রাণ মুগ্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আরো দু-চারটে গান তৈরী করে দিচ্ছি, তোরা এই রকম সুর করেই গাইবি। তারপর বললেন, দ্যাখ শুধু হাততালি দিয়ে গান গাইলে গান তেমন জমে না তোরা কিছু যন্ত্র সংগ্রহ কর।

আমি তখন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে বললাম, কি যন্ত্র সংগ্রহ করব?

এর উত্তরে ঠাকুর বললেন, তোরা যদি আর কোন যন্ত্র সংগ্রহ করতে না পারিস তবে লাউ-এর খোল যোগাড় করতে পারিস। লাউ-এর খোল দিয়ে একতারা তৈরী করে নে, একতারা খুব ভাল জিনিস, এতে সেতারের মতো সুন্দর সুর হয়।

ঠাকুরের কথা শুনে আমরা তাড়াতাড়ি লাউ-এর খোলা যোগাড় করে প্রত্যেকে এক-একটি একতারা তৈরী করে নিলাম। সেই থেকে আমরা একতারা বাজিয়ে আনন্দে হরিনাম কীর্তন করতাম।

আমরা যখন ভাবে কীর্তন করতাম তখন ঠাকুর আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। একদিন তিনি একটা খোলের দাম দিয়ে বললেন তোরা দুটো খোল কিনে নে আরো কিছু টাকা যোগাড় করে। খোল করতাল আর একতারা নিয়ে তোরা পথে পথে ও লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কীর্তন করতে করতে হরিনাম প্রচার করবি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলবি তোমরা হরির লুট দাও।

ঠাকুরের কথামতো আমরা তাই করতে লাগলাম। এই ঘটনার দু-এক দিন পর ঠাকুর একদিন আমাকে বললেন, আমি তোদের মধ্যে থেকে চার-পাঁচজনকে বেছে নিতে চাই। তারা রোজ সন্ধ্যার সময় কিশোরী ডাক্তারের ডিসপেনসারীর ঘরে কীর্তন করবে। অন্য সবাই বাইরে কীর্তন করবে। দু দলের দুটো খোল থাকবে। তাঁর কথামতো আমরা যখন সন্ধ্যার সময় কিশোরী ডাক্তারের ডিসপেনসারী ঘরে কীর্তন করতাম, তখন মাঝে মাঝে ভাবসমাধি হতো ঠাকুরের। সে ঘরের মধ্যে ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে কীর্তন করতেন। ঠাকুরের ভাবসমাধি হলে তাঁর কানের কাছে আমরা অনেকক্ষণ ধরে জোর কীর্তন করতাম। এইভাবে দু-এক ঘন্টা কীর্তন করার পর তাঁর সমাধি ভঙ্গ হতো এবং তিনি স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেতেন। ভাবসমাধি কী আমি তখন জানতাম না। তবে শুনেছিলাম, কীর্তন করতে করতে কারো ভাবসমাধি হলে কীর্তন বন্ধ করতে নেই। বন্ধ করলে তার মৃত্যু হয়। এক-একদিন সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি আসনাদিও করতেন। এই সমাধির সময় সত্যি সত্যিই তাঁর বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একদিন আমি দেশলাই জ্বেলে তাঁর হাতের একটি আঙুল সেই

আগুনের উপর রাখলাম। দেখলাম আঙুলটিতে ফোস্কা পড়লেও তা একেবারে পুড়ে গেল না। এবং ঠাকুরও যন্ত্রণায় কোন আর্তনাদ করলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে কোন যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে এলো না।

জ্ঞান ফিরে এলে ঠাকুর সেই আঙুলটি আমাকে দেখিয়ে বললেন, দেখ তো মকুন্দ আমার এই আঙুলটা জ্বালা করছে কেন? আমি তখন আমার কুকর্মের কথা সব ঠাকুরকে অকপটে বললাম।

তিনি তা শুনে মৃদু হেসে আমাকে বললেন, কারোর গায়ে আগুন দিয়ে এই সব পরীক্ষা করতে নেই। এই সব আর করিস না।

এই ঘটনা থেকে বুঝলাম ঠাকুরের ভাবসমাধি কত গভীর ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত ছিল। বুঝলাম তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি ঐশীশক্তিসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ প্রেম ভক্তি ও সকল মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসের দর্শনের ছাত্র সুশীলচন্দ্র বসু একই সঙ্গে ল'ও পড়তেন। তখন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস। এইসময় একদিন দেশে এসে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তা তিনি নিজের ভাষায় সব কিছু সুন্দর ভাবে লিখে গেছেন। সেই লেখায় তিনি বলেন, একদিন আমি কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ায় আমার ভগ্নীকে দেখতে এলাম। আর ভগ্নীপতি অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকেই দেখলাম একজন সুঠাম সুন্দর চেহারার ব্রাহ্মণ যুবক বসে আছেন। তাঁর গলায় ছিল যজ্ঞোপবীত। তাঁর স্নেহমাখা দৃষ্টি আমাকে দুর্বার আকর্ষণ করতে লাগল। আমাকে দেখেই তিনি উঠে এসে আমার সঙ্গে পরিচিত না হয়েই আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, আমাকে কেমন লাগছে?

আমি তাঁর মধুর আচরণ ও কথায় অভিভূত হয়ে বললাম আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন আমার অনেক দিনের চেনা। মনে হচ্ছে এক পরম আত্মীয়।

তখন ঠাকুর বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

এরপর আমি হাত মুখ ধুতে গিয়ে আমার ভগ্নীপতির কাছে জানলাম, এই ভদ্রলোকের নাম অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁকে সবাই ঠাকুর বলে ডাকে। কীর্তন করতে করতে তাঁর ভাবসমাধি হয়। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। মুখ থেকে নানা রকমের গভীর তত্ত্বপূর্ণ বাণী বেরিয়ে আসে। তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে টীকা পুড়িয়ে তাঁর গায়ে ছ্যাঁকা দিলেও তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে না।

এইসব কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যাই হোক, হাত মুখ ধুয়ে এসে

আমি সেই ঘরে ঢুকেই ঠাকুরের কাছে এমন কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম যাদের চরিত্র অতি নিকৃষ্ট ধরনের বলে জানতাম, তাই তাঁর মতো লোকের কাছে ঐ সব লোকদের দেখে স্বাভাবিক ভাবেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। পরে অবশ্য সেই সব লোকদের কাছে জানলাম ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়। তারা সবাই অসৎপ্রবৃত্তি দূর করে সব সৎ হয়ে ওঠে। এ যেন সল-এর পল-এ পরিণত হওয়া এবং শয়তানের সাধুতে পরিণত হবার ব্যাপার।

এরপর তাঁর সঙ্গে আমি নিরালায় কিছু কথাবার্তা বলতে চাইলাম। তিনি আমাকে নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে একে একে আমার সব প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর দিতে লাগলেন। দর্শনের ছাত্র হিসাবে ধর্ম রাষ্ট্র সমাজ.প্রভৃতি বিষয়ে যত প্রশ্ন আমার মনে বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল, আমি তা সব উজাড় করে ব্যক্ত করলাম তাঁর কাছে। তিনি আমার সব প্রশ্নের উত্তরে যা যা বললেন তাতে আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হলাম। আমার তখন কেবলই মনে হতে লাগল একটি মানুষ এত সব বিষয়ে এমন গভীর জ্ঞান কী করে লাভ করলেন? বিশেষত যিনি বলতে গেলে উচ্চশিক্ষার ধার ধারেন না। খাওয়ার পর আমরা দুজনে এক ঘরেই শুলাম। সারারাত ধরে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তরের অনুষ্ঠান চলতে লাগল।

সারারাত ধরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমার এই মনে হলো যে, তিনি সর্ববিধ বিদ্যায় শিক্ষিত। পারমার্থিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক মুক্তির বার্তা নিয়ে জগতে এযাবৎ বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু তাতে সঙ্কীর্ণ মুক্তি জগতের কোন বন্ধন ঘোচেনি। তবে কি ইনি সেই একাধারে সূর্যমুখী বিকাশের নরদেবতা, যাঁর অপেক্ষায় মানবসমাজ যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করে আছে? সেদিনের আলোচনা থেকে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠল যে, সর্বমানবের প্রতি তাঁর প্রাণভরা দরদ-তাঁর মানবপ্রীতি জাতি ধর্ম দেশ-কালের দ্বারা সীমিত নয়।

পরদিন সকালে হাত মুখ ধুয়ে তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমার মুখপানে এমন স্নেহশীল দৃষ্টিতে তাকালেন যে আমার মনে হলো স্বয়ং রামকৃষ্ণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিনি, শুনিনি তাঁর কণ্ঠস্বর। তবে তাঁর কথামৃত বইখানি পড়ে আমার এক অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল। এখন ঠাকুরকে দেখে আমার মনে হলো শ্রীরামকৃষ্ণই যেন আমার দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এবং তিনি ঠাকুরের মুখ দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন।

তিনি আমাকে তার কাছে এগিয়ে যেতে বললে আমি তাঁর কাছে গিয়ে কেন জানি না সরাসরি বললাম আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই দীক্ষা দিলেন। সেদিন ছিল ৭ই নভেম্বর, আমার জন্মদিন। আমার দ্বিতীয় জন্ম হলো সেই একই দিনে। গতজন্মের অনেক পরে আজ এক নতুনতর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যেন আমার আত্মার নবজন্ম হলো আজ।

৭ই ও ৮ই নভেম্বর তাঁর সঙ্গে কুষ্টিয়ায় থাকার পর ৯ তারিখে কলকাতা ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। ঠাকুরও রাতুলপাড়ায় চলে গেলেন। কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভের জন্য মন আমার এমনই ব্যাকুল হয়ে উঠল যে, সেদিন আমি কলকাতায় যেতে পারলাম না। পরদিন আমি একজন লোকের সঙ্গে রাতুলপাড়ায় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হলাম আবার।

সন্ধ্যাবেলায় কীর্তনের আসর বসল। শঙ্খ কাঁসর ঘন্টা বেজে উঠল, খোল করতাল সহ সকলে মিলে কীর্তন ও তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন। ঠাকুরও দুই বাহুতুলে মনোহরভঙ্গীতে প্রাণের উচ্ছল প্রাচুর্যে নৃত্য করতে লাগলেন।

কীর্তন করতে করতে সহসা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ঠাকুর মাটিতে পড়ে গেলেন। মনে হলো তার দিব্য দেহখানি সমস্ত চেতনা হারিয়ে নিস্পন্দ নিথর শবের মতো পড়ে আছে। এই সময় পাশের একজন লোক ঠাকুরের নিস্পন্দ দেহের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমি দেখলাম সেই বুড়ো আঙুলটি থরথর করে কাঁপছে। হাত দিয়ে দেখলাম শরীর ঠাণ্ডা। এত উদ্দাম কীর্তনের পর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ যে দেখছি হৃৎপিণ্ডের কোন ক্রিয়াই নেই। চোখ দুটি পলকহীন।

এমন সময় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল অমৃত বাণী। সে বাণী হলো—

রাখ, ওগো রাখ। সব রক্ত—কেবল রক্ত—রক্তগঙ্গা ছুটে গেল। এখনও নীরব নিস্পন্দ? এখনও ঘাতকের মতো ভুলে আছিস? প্রেমের সন্তান তোরা? চারদিকে রক্ত, রক্তের আকাশ, রক্তের বাতাস, রক্তের আগুন, রক্তের পৃথিবী, রক্ত—রক্ত—কেবল রক্ত। কে আছিস তোরা? আয় কে আছিস? ডাকতে জানিস? ডাকতে দে। প্রেম, ভিক্ষা। ঐ দ্যাখ, ঐ দেশের মাটিতে বুকে ধরে হৃদপিণ্ড দিয়ে কে প্রেম দিয়ে গেছে রে! ওরে সে যে আমারই, নির্দয়রূপে চোরের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। আর তোরা এখনো নীরব নিস্তব্ধ? পশুর মত কামাসক্ত, আমোদপ্রিয়?

সেই দিনটা ১০ই নভেম্বর ১৯১৭, তখন ইউরোপে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে। সেই রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রামকে উপলক্ষ করে যে এই বাণী তা বুঝতে কষ্ট হলো না।

তারপর আবার বাণী নির্গত হতে লাগল। যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু কচ্ছে, সব শব্দতরঙ্গ থেকে চৈতন্যরঙ্গই ব্রহ্ম। সহস্রদল থেকে বাহিরের ধারা পিণ্ডে এসেছে। করা যায়—তবে ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডে কি এসে যায়? পিণ্ড একদম ভুল। যে ইচ্ছা থাকে পিণ্ডে,

সেই ইচ্ছাই সৃষ্টি, অষ্টসিদ্ধি ইহারই অন্তর্গত।

বুঝলাম সৃজন প্রকৃতির কথা বলছেন।

সেদিন ঠাকুরের এই অবস্থা অর্ধঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসবার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি বলে উঠলেন-জল খাব রে, জল খাব। অনন্ত মহারাজ নিকটেই ছিলেন। একটি পরিষ্কার তামার ঘটিতে করে তিনি জল এনে ঠাকুরকে খেতে দিলেন।

এইভাবে রামকৃষ্ণদেবেরও ভাবসমাধি হতো। সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করেই ভূমিতে নেমে আসতেন এবং জল খাব বা তামাক খাব বলতেন। এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঠাকুরের কী অদ্ভুত মিল! তবে সমাধিকালে রামকৃষ্ণদেবের মুখ থেকে কোন বাণী নির্গত হতো না।

কীর্তনরত অবস্থায় ঠাকুরের ভাবসমাধি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে এই ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সেগুলি সত্যিই বিস্ময়কর।

৮

ক্রমাগত হরিনাম সংকীর্তন ও ভাবসমাধির ফলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠে। তিনি এই পার্থিব জীবনের সমস্ত জৈব চেতনাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে এক অতিমানসচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হন। এই অবস্থায় এক নিবিড়তম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নির্যাসরূপে এক অমৃত রসক্ষরিত হতো তাঁর অন্তরাত্মার মধ্যে। এটাই হলো মোক্ষলাভের অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক পার্থিব সকল আসক্তি ও মায়ার বন্ধন থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে কেবল পরব্রহ্মে তাঁর সমস্ত মনপ্রাণকে স্থিরভাবে নিবিষ্ট করেন। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষলাভ করেও ঠাকুর কিন্তু শান্তিলাভ করতে পারতেন না। ঈশ্বরকোটি সাধকদের মতো ঠাকুর ঈশ্বর লাভ করে ক্ষান্ত হতে পারেননি। ঈশ্বরকোটি সাধকেরা ঈশ্বর প্রাপ্তিজনিত সুউচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পর আর তাঁরা ভূমিতে সাধারণের মাঝে নেমে আসেন না। কিন্তু জীবকোটির সাধক ঠাকুর ঈশ্বর প্রাপ্তির পরেও জীবকল্যাণের কথাটি ভুলতে পারেননি। জাতি ধর্ম ও উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের এক ঐকান্তিক বাসনা তাঁর যৌবনকাল থেকেই তাঁর সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ ছিল যেন তাঁর ঐ ব্রত বা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় মাত্র।

শুধু তাঁর নিজের গ্রাম নয় সারা দেশের বিভিন্ন জেলা ও গ্রাম জুড়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে সমস্ত মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং তাদের

মঙ্গলচিন্তা করতেন।

ঠাকুর দেখলেন সমাজের সর্বত্র পাপের নারকীয় লীলা চলছে। চারদিকে নানা পাপকর্মের বীভৎস চিত্রটি সবসময় যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসত। আর তা দেখে মর্মাহত হয়ে পড়তেন। তিনি লক্ষ্য করতেন সমাজের বহু মানুষ মঙ্গলময় ভগবানের চিন্তা ভুলে গিয়ে অসৎ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। ঠাকুর ভাবতে লাগলেন তিনি তাঁর এতদিনের ধর্মসাধনার দ্বারা যে অমিত আধ্যাত্ম সম্পদ লাভ করেছেন, তা যদি জনকল্যাণের জন্য উদার অকৃপণ হস্তে সবার মধ্যে বিলিয়ে না দেন, তা হলে তার সার্থকতা কোথায়। তিনি কেবল মাত্র ঈশ্বর দর্শন করতে চাননি বা ঈশ্বরকে শুধু নিজের মুক্তির জন্য লাভ করতে চাননি। তিনি ঈশ্বরকে কল্যাণতম রূপে দেখতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বের কল্যাণ সাধনের জন্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুর তাঁর এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁর কয়েকজন অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে হরিনাম সংকীর্তনের এক দল গঠন করেছিলেন আগেই। কিন্তু শুধু দল গঠন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি দেখলেন প্রতিদিন নিয়মিত কোন এক বিশেষ স্থানে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হলে তাঁর আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না তাতে। তাই তিনি চাইলেন তাঁর এই কীর্তনের দল গ্রামে গ্রামে পথে ঘুরে ঘুরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে হরিনামামৃত বিতরণ করবে।

প্রতাপপুরের কিশোরীমোহন দাস কাশীপুরের অনন্তনাথ রায়, নাজিপুরের দুর্গানাথ সান্যাল, মাঝিপাড়ার কোকন বুনে ও তরণী বুনে প্রভৃতি তাঁর কীর্তনদলে যোগদান করে ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠলেন। কিছুদিন পর সালগেড়িয়ার শ্রীমৎ অদ্বৈত মহাপ্রভুর কৃতী বংশধর গোস্বামী সতীশচন্দ্র এসে এদের সঙ্গে যোগ দেন। এদের মধ্যে কিশোরীমোহন ও সতীশচন্দ্র উভয়ে ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর প্রবর্তিত পতিতপাবন সত্যনাম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ কাজে তাঁদের মন প্রাণ উৎসর্গ করে কৃতার্থ বোধ করেন তাঁরা। তাঁরা কীর্তনের দল নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত দেশবাসীর কাছে নামপ্রচার করে যেতে থাকেন। ভক্তগণের ইচ্ছায় ও অতিশয় আগ্রহবশত ঠাকুর নিজেও ঐ কীর্তনদলের সঙ্গে বহু জায়গায় গিয়ে বহু লোককে প্রেমানন্দে মাতিয়ে তুলতেন।

সমবেত জনতা তাঁর প্রাণমাতানো কীর্তন ও নর্তনে মুগ্ধ হতো। তাঁর ভাবসমাধি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতো। তাঁর অলৌকিক শক্তি ও প্রেরণা দেখে হতবাক হতো। বহু লোক তাঁকে ভগবানের অবতার বলেও বিশ্বাস করতো। তিনি যখনই যেখানে

যেতেন, শত শত নরনারী ভক্তিবিগলিত চিত্তে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে সৎ নাম গ্রহণ করতো এবং এই নাম গ্রহণ করে তারা নিজেদের ধন্য মনে করতো।

দীর্ঘকাল ধরে বহুস্থানে সৎ নাম প্রচারের ফলে ঠাকুরের নাম ক্রমে ক্রমে বাংলার নানা জেলায় প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আর তার ফলে বিপুল প্রেম ও ভক্তিভাবের এক দিব্য উন্মাদনা জাগল জনগণের মধ্যে। সৎ নামের প্রভাবে বহু মানুষের অসৎ প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সৎ প্রকৃতিতে পরিণত হলো।

এই সৎ নাম প্রচার কীভাবে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে তার বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। যে কীর্তনানুষ্ঠান প্রথমে প্রতাপপুরের ডাক্তার কিশোরীমোহন দাসের বাড়িতে প্রথম শুরু হয়, সেই কীর্তন ধীরে ধীরে প্রতাপপুরের পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সেই গ্রামের লোকেরা নিজেদের সংসারজীবনের সুখদুঃখের কথা সব ভুলে গিয়ে এক নির্মল কীর্তনানন্দে মত্ত হয়ে ওঠে। ঠাকুরও এক-একদিন এক-একটি গ্রামে গিয়ে সেই কীর্তনানুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন। কীর্তনের শেষে ঠাকুর সকলের সামনে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে সকলকে নীতি ও ধর্মোপদেশ দান করতেন।

ঠাকুর যখনই সুযোগ পেতেন তখনই গ্রামের নারীদের আত্মোন্নতির জন্য বহুরকম চেষ্টা করতেন।

হিমাইতপুর ও তার নিকটবর্তী ছাতনি, প্রতাপপুর, সাহাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে প্রবীণা রমণীরা জল নেওয়ার জন্য পাড়ার বৌ-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কলসী কাঁখে ঠাকুরবাড়ির ঘাটে এসে সমবেত হতেন। তখন ঠাকুর ঐ সময় পদ্মার ধারে পাঁচচালা ঘরের সামনের উঠোনে উপস্থিত হয়ে প্রবীণাদের সঙ্গে নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁদের শিক্ষা দিতেন, ঠাকুরের শ্রীমুখের অমৃতবাণী শোনার জন্য প্রবীণা নবীনা নির্বিশেষে সকল নারীরা দূরে কলসী রেখে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসতেন। ঠাকুর এই সুযোগে হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে এই সব নারীকে নানা রকমের সৎ শিক্ষা ও সৎ উপদেশ দান করতেন। কারণ তিনি জানতেন নারীদের আত্মোন্নতি না ঘটলে সংসারে কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হবে না। সেকালের নানা প্রথা ও কুসংস্কারের জঞ্জালে নারীদের মন আচ্ছন্ন ছিল। দেশে নারী শিক্ষার কোন ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল না। তাই অশিক্ষিতা ও সঙ্কীর্ণমনা নারীরা পাড়ায় পাড়ায় প্রায়ই ঝগড়া বিবাদে মুখর হয়ে থাকত। স্বামী সন্তানদের সঙ্গেও সব সময় সদ্ ব্যবহার করতে পারত না। এক মধুর সদ্ ব্যবহার ও সদাচরণ দ্বারা নারীরা ঘরে বাইরে সকলের মন প্রীত করে তুলতে পারত না।

ঠাকুর দেখলেন এক উচ্চ আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে না পারলে নারীদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি সম্ভব হবে না। তাই তিনি এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে নারীদের প্রতিদিন নিয়মিত সৎ উপদেশ দান করতে লাগলেন।

আর সেই সব নারীরাও ঠাকুরের মহামূল্য মধুর উপদেশবাণী সশ্রদ্ধ চিত্তে উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনে যেতেন। এই বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের অন্ত ছিল না।

কখনো বা মহামানবের জীবনী ও বাণী, কখনো মহীয়সী আর্যনারীর কীর্তিকাহিনী, কোনদিন আবার সদ্‌গুরু সৎ নাম ও সৎ সঙ্গের মহিমা, কখনো শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-পুত্র-পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য পালন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দান করতেন ঠাকুর।

এইভাবে ঠাকুর সমবেত নারীদের সামনে একগুচ্ছ নারীত্বের আদর্শকে তুলে ধরেন। সেই আদর্শের প্রেরণায় ঐ সব নারীরাও আপন আপন সংসারে স্বামীপুত্রদেরও সৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। সংসারের সব লোক যদি এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে সেই সংসারে কখনো বিবাদ-বিসংবাদ ঘটতে পারে না। তাঁদের মধ্যে কখনো কোন তীব্র মতবিরোধ ঘটতে পারে না। সকলেই তখন তারা সেই আদর্শের খাতিরে সকলে এক মত হয়ে মিলেমিশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। এইভাবে ঠাকুরের মহান চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে নারীরা এক সৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের আপন আপন সংসারকে সুখের করে তুললেন।

এবার এই সৎ নাম প্রচারের কাজকে অন্য সব গ্রামে ও দূরদূরান্তে প্রসারিত করার জন্য ঠাকুর সতীশচন্দ্র গোস্বামীকে আহ্বান জানালেন। সতীশচন্দ্র গোস্বামীও ঠাকুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই নাম প্রচারের ভার সানন্দে গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমে বারদী গ্রামে এসে কাজ শুরু করলেন। তাঁর মহতী চেষ্টার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গ্রামের অসংখ্য নরনারী সৎ নামের দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হলেন। তিনি প্রথমে গ্রামের জমিদার গোপেন্দনাথ সাহা (খোকা ডাক্তার), তাঁর ভাই এবং একে একে পরিবারের সকলকেই সৎ নামে দীক্ষিত করেন। পরে এই গ্রামের ধনী ব্যবসায়ীরাও একে একে সৎ নামের দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর কুষ্টিয়ার গোকুলচন্দ্র সুযোগ পেলেই ঠাকুরের কাছে হিমাইতপুরের আশ্রমে চলে আসতেন।

শ্রীঠাকুরের মহান সান্নিধ্য লাভে ও তাঁর স্পর্শে এক অপার আনন্দ অনুভব করতেন তিনি। তখন তাঁর কেবলই মনে হতো তাঁর মতো সারা দেশে অসংখ্য নরনারী ঠাকুরের চরণে এসে আশ্রয় নিতো এবং তাঁর অমিয় স্পর্শ লাভ করতে পারতো, তাহলে দেশের কতই না মঙ্গল হতো!

গোকুলচন্দ্র ভাবলেন ঠাকুরকে একবার কোন রকমে কুষ্টিয়া নিয়ে যেতে পারলে সেখানকার লোকদের অশেষ মঙ্গল হয়। এই ভেবে তিনি ঠাকুরকে কুষ্টিয়া যাবার জন্য

এমনভাবে ধরে বসলেন যে ঠাকুর কিছুতেই তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারলেন না। অবশেষে ১৩২১ বঙ্গাব্দে ঠাকুর তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় গমন করেন। স্থানীয় বারের প্রবীণ উকিল হরিশচন্দ্র রায়ের আমলা পাড়ার বাসায় তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। হিমাইতপুরের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কুষ্টিয়ায় এসেছে এই সংবাদ লোকমুখে প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নরনারী ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য সতীশচন্দ্রের বাড়িতে এসে ভিড় করতে থাকেন। সারাদিন ধরে ঠাকুর বহু মানুষকে উপদেশ দান করে সকলকে সৎ নাম ও সদ্ গুরুর মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সমানে কীর্তন চলত। এই কীর্তনে কিছু সময় পদকীর্তন ও পরে তারকব্রহ্মনাম গাওয়া হতো। সেই মহাকীর্তনে দশ-বারোটি খোল, দশ-বারো জোড়া করতাল, বড় বড় জয়ঢাক, অসংখ্য শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। শহরে বড়ো বড়ো উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনসাধারণ সেই মহাকীর্তনে যোগ দিতেন।

ঠাকুরও সেই কীর্তনে নিয়মিত যোগ দিতেন। কীর্তন ও নৃত্যরত ঠাকুরের দিব্যকান্তি ও ভাবাবেশ দেখে সকলেই মুগ্ধ হতেন। কীর্তনরত অবস্থায় মাঝে মাঝে তাঁর ভাবসমাধি হতো। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হতো তা শুনে সকলেই ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতো।

ঠাকুর যতদিন কুষ্টিয়ায় ছিলেন ততদিন সেখানকার অসংখ্য ত্রিতাপজ্বালা জর্জরিত নরনারী জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসত। ঠাকুর অশেষ ধৈর্য সহকারে সকলের সব কথা শুনে স্নেহশীল মধুর কণ্ঠে তাঁদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। আর সেই সব উত্তরের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পেত।

ঠাকুর সত্যনাম প্রচারের জন্য হিমাইতপুর থেকে মাঝে মাঝে কুষ্টিয়া যেতেন এবং সেখানে এক এক বার দশ-বারোদিন করে অবস্থান করতেন। সেখানে কীর্তন করতে করতে কখনো কখনো কীর্তনের দল নিয়ে নগর পরিক্রমায় বার হতেন। তখন সারা শহর হরিনাম সংকীর্তনের সমবেত ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত। কীর্তনদলের মধ্যে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে দেখে পথের দুপাশে বহুলোক কীর্তনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো। সেই কীর্তন দেখে ও শুনে শহরের অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে অপার আনন্দ জাগত। এক অনির্বচনীয় পুলকে শিহরিত হয়ে উঠত তাদের সর্বাঙ্গ। হরিনাম কীর্তনের মধ্যে যে এত মাধুর্য আছে এবং সে মাধুর্য পার্থিব জীবনের সবকিছুকে এক মুহূর্তে ভুলিয়ে দিতে পারে তা কেউ আগে জানত না।

কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরীর কুষ্টিয়ার বাজারে এক বড় কাপড়ের দোকান ছিল। একদিন সকালে তিনি ঠিক করলেন যাওয়ার পথে আগে তিনি ঠাকুরের কীর্তন দেখবেন এবং তারপর বাজারে গিয়ে দোকান খুলবেন। কৃষ্ণলালবাবু ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত এবং ঠাকুরও তাঁকে ভালবেসে কেষ্টপাগল বলে ডাকতেন। দোকানে থাকার জন্য তিনি কীর্তনে যোগ দিতে পারতেন না।

সেদিন সকালে কৃষ্ণলালবাবু ঠাকুরের বাসায় গিয়ে দেখলেন তখনও কীর্তন শুরু হয়নি। ঠাকুর তাঁর বিছানায় বসে ছিলেন। কৃষ্ণলালবাবু ঠাকুরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর তাঁর হাত ধরে তাঁর বিছানার উপর বসালেন এবং তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ঠাকুরের এই অহেতুক কৃপা ও তাঁর মধুর স্পর্শ ও সঙ্গসুখ লাভ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণলালবাবু। তিনি সেদিন দোকানে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে সারা দিন ধরে ঠাকুরের সঙ্গসুখ উপভোগ করে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলেন।

কুষ্টিয়ায় ঠাকুরের তপোবন বিদ্যালয় ও নাম চিকিৎসালয় স্থাপন এবং কলাবাগান ও কমলাপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ঠাকুরের এক উজ্জ্বল কীর্তি।

একদিন কুষ্টিয়ায় এক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ঠাকুর। এ বিষয়ে তিনি ভক্তদের কাছে তাঁর সেই আদর্শ বিদ্যালয়ের স্বরূপ কি হবে তা তিনি ভক্তদের বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, দেখুন আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলছে তাতে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগ নেই। সেই শিক্ষার প্রতি কোন অনুরাগ বা শ্রদ্ধা নেই ছাত্রদের মনে। যে শিক্ষায় ছাত্রের শ্রদ্ধা নেই সেই শিক্ষা থেকে কোন জ্ঞানই সে লাভ করতে পারে না। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে থেকে ছাত্রেরা আচার্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করে তাঁর আদেশ পালন করে যেত। গুরুর প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞান লাভে সাহায্য করত তাদের। এই জ্ঞান দ্বারাই তারা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত। গুরুও ছিলেন পাণ্ডিত্যে, চারিত্র্যে, নীতিবোধে ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিপুণ। তাঁর চরিত্র মহিমায় মুগ্ধ হয়ে ছাত্রেরা যেমন তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করত, গুরুও তেমনি ছাত্রদের আপন সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। গুরুশিষ্যের মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতো। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্কের পরিবর্তে এক অবাঞ্ছিত ব্যবধান বেড়ে চলেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার প্রতি কোন অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাকায় ছেলেরা কিছু প্রাণহীন পুঁথিগত বিদ্যা অনুশীলন করলেও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারছে না ছাত্রেরা। তাই তাদের নৈতিক চরিত্রের

মানও উন্নত হচ্ছে না। আর তার ফলেই জাতীয় জীবনের এই অধঃপতন চলছে।

যাতে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে উপযুক্ত আচার্যের সান্নিধ্যে থেকে ছাত্রেরা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে ও আপন আপন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিদ্যার অনুশীলন করতে পারে, যাতে তারা সহজাত সংস্কারগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে ভবিষ্যতের জীবনসংগ্রামে জয়লাভের শক্তি অর্জন করতে পারে, আমি সেই ধরনের আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে ছাত্রদের উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং তাদের এমন কর্মপ্রেরণা দান করা যাতে তারা দেশ ও সমাজের সেবার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

ঠাকুরের পরিকল্পনা মতো ছাত্রদের আদর্শবান শ্রদ্ধাবান ও সচ্চরিত্র গঠনের এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় ভক্তবৃন্দ, কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ সাধন করে চলতে শেখানোই হবে এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমে এই বিদ্যালয় যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় তারও সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আচার্যানুরাগী ও শ্রদ্ধামূলক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

এই বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী জানকীনাথ সাহা রায় তাঁর খোকসা জানিপুরের তিন বিঘা জমিসহ বিস্তৃত বাগানবাড়ি ও নগদ কয়েকশো টাকা দান করেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ বি. এল, প্রমথনাথ শিকদার বি.এ. বি.এস.সি, বি.এল, প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য কর্মী শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়টির কাজ আরম্ভ হয়। কিছুদিনের মধ্যেই জানকীনাথ প্রদত্ত জমিতে বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ছেলেদের পাঠ দানের সঙ্গে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ছাত্র শিক্ষক মিলে সমবেত প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়।

একদিন ঠাকুর ভক্তদের সামনে সৎ নামের মহিমা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন সৎনামই আদি নদ সৃষ্টির মূল উৎস। অস্তিত্বের ধারণ ও রক্ষণের জন্য অটল বিশ্বাস ভক্তির সঙ্গে নামী পুরুষের (সদ্‌গুরু) ধ্যান সমন্বিত নাম জপই সর্বোত্তম পন্থা।

নাম মাহাত্ম্যের কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি আরো বলতেন, আমাদের হাত, পা, চোখ, কান দিয়ে সবসময় রঞ্জন রশ্মির মত এক অদৃশ্য আলোক তরঙ্গ বাইরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর মাথাটা যেন বাইরে থেকে ঐ আলো শোষণ করে শরীরের ভেতরে নিচ্ছে। এই প্রবাহই আমাদের জীবনীশক্তি। মানুষের মৃত্যু ঘটলে এই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

খুব বেশি নাম করলে দেহের মধ্যে প্রবাহিত ঐ আলোক তরঙ্গ মস্তিষ্কে সংহত

হয়। চোখ দিয়ে তা ঠিকরে পড়ে। তখন কারোর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঐ জীবনীশক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় আর তার ফলে তার মধ্যে এক স্পন্দন শুরু হয় এবং সে মরে গেলে বা মৃতপ্রায় হলেও সে আবার জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

এ সম্পর্কে ঠাকুর তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও ব্যক্ত করেন।

একদিন ঠাকুর একটি গুবরে পোকাকে মৃতাবস্থায় দেখতে পান। বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর তিনি বুঝতে পারেন পোকাটি সত্যিই মৃত। জীবনের কোন চিহ্ন নেই তার মধ্যে। পোকাটির মাথার সঙ্গে দুটো পা সংযুক্ত আছে। শরীরে অবশিষ্ট অংশ বলতে আর কিছুই নেই। এই অবস্থায় নামের শক্তি পরীক্ষার জন্য ঔৎসুক্যবশত তিনি একটি আঙুল দিয়ে পোকাটিকে ধরে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে নাম জপ করতে লাগলেন। এরপর হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন পোকাটার পা দুখানি একটু একটু নড়ছে। তারপর উপুড় হয়ে খানিকটা চলল। কিন্তু তারপর আবার চিৎ হয়ে পড়ল, আর চলতে পারল না। তখন তিনি আবার পোকাটিকে স্পর্শ করে নাম করতে লাগলেন। আবার পোকাটা একটু নড়ল এবং চলল। কিন্তু তারপরই আবার চিৎ হয়ে পড়ল, আর নড়ল না। এই ভাবে কয়েকবার পরীক্ষা করার পর ঠাকুর বুঝতে পারলেন, এর মাথা এবং দুটি পা ছাড়া শরীরের আর কোন অংশ নেই, তাই নামের শক্তিতে এ প্রাণ ফিরে পেলেও তা ধারণ করার ক্ষমতা এর নেই।

আর একদিন ঠাকুর একটি মৃত আরশোলাকে স্পর্শ করে নাম জপ করার ফলে মৃত আরশোলাটি পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তার ফলে ঠাকুরের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে যে নামস্পন্দনের শক্তিবলেই মৃত আরশোলা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এইভাবে তিনি আরও কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে নাম স্পন্দনের শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ওঠেন।

ঠাকুর বুঝলেন, নাম স্পন্দনের এই শক্তি ব্যাপক ভাবে মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করলে বহু লোকের উপকার হবে। জনসাধারণকে নাম জপের শক্তি প্রয়োগের সুফল দান করার জন্য এক নাম চিকিৎসালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন ঠাকুর। নাম স্পন্দনের সাহায্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার ও তার গতিবেগ বৃদ্ধি করে মৃতব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত এবং দুরারোগ্য রোগীকে নিরাময় করে তোলার জন্য এক চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন ঠাকুর।

কুষ্টিয়ার এক ধারে রাস্তার উপর একটি দোতলা বাড়িতে সেই নাম চিকিৎসালয় স্থাপিত হলো। সতীশচন্দ্র গোস্বামী, বীরেন্দ্রনাথ রায়, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সুশীলচন্দ্র বসু, মহম্মদ গহর আলী, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, রাধারমন জোয়ারদার প্রভৃতি ইষ্টপ্রাণ

ভক্তগণ এই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ঠাকুরের নির্দেশমত এরা বহু জায়গায় বড় বড় ডাক্তারদের দ্বারা পরিত্যক্ত বহু মৃতপ্রায় মুমূর্ষু রোগীকে নাম চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে কুষ্টিয়ার ডাকপিয়ন লক্ষ্মণ ঘোষ, বরৈচারার জানকী হালদার ও মতি সাহা প্রভৃতি তুমুল কীর্তনের মাধ্যমে নাম স্পন্দনের শক্তিবলে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে আশ্চর্যরূপে রক্ষা পেয়েছিলেন।

এইভাবে নাম চিকিৎসার দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় ও মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা সম্বন্ধে আরো বহু ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে নাম চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন প্রবীণ ভক্তের বিবৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ বিষয়ে সতীশচন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমি নিজেও একবার একটি মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচাবার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম। রোগীর নাম শ্রীকান্ত সরকার, বয়স অনুমান ২৭/২৮। সে ম্যানেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়।

তখন এই রোগের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। রোগীর আরোগ্য লাভের কোন আশা নেই দেখে ডাক্তাররা তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। তখন রাত্রি ১১টা। রোগীর নাড়ি ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সে অবস্থায় আমি ও আরও পাঁচজন রোগীকে স্পর্শ করে একাগ্রচিত্তে নাম জপ করতে লাগলাম। সারারাত্রি ক্রমাগত নাম জপ করার পর পরদিন সকাল বেলায় রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হচ্ছে বলে টের পাওয়া গেল। তখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান। আমরা ছজন তখন প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলাম। অপর ছজন আমাদের পরিবর্তে রোগীকে স্পর্শ করে নাম জপ করতে লাগল। তিনদিনের দিন রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলো। তিন দিন পর সে রোগীকে দুরারোগ্য রোগের কবল থেকে মুক্ত ও সুস্থ দেখে আমাদের যে অপূর্ব আনন্দ হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রীকান্তের বিধবা মা ও তার স্ত্রী শ্রীকান্তের পুনর্জীবন প্রাপ্তির জন্য ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম জানিয়ে তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল।

রাধারমণ জোয়ারদার বলেন, একসময় কুষ্টিয়ায় সৎসঙ্গ প্রাণ তত্ত্বানুসন্ধান সমিতি আমাদের কুষ্টিয়াস্থিত পাকা বাড়িতে স্থাপিত হয়। রোগীদের জন্য সেখানে ১৫/১৬টি শয্যা ছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকল ধর্মাবলম্বী রোগীকেই সেখানে চিকিৎসা করা হত। সতীশচন্দ্র গোস্বামী, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, মহম্মদ গহর আলী বিশ্বাস প্রভৃতি

ভক্তগণ নামের শক্তি প্রয়োগ করে বহু কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীকে রোগমুক্ত করেছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশমত এই নাম চিকিৎসা হতো। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক ও রোগী উভয়কেই নাম করতে হতো। কিন্তু অশক্ত ও অপারগ রোগীর বেলায় কেবল চিকিৎসককেই নাম করতে হতো। নাম করার কৌশল চিকিৎসকরা ঠাকুরের কাছে উত্তমরূপে শিখতেন।

ঠাকুরের নির্দেশে আমিও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা প্রণালী শিখে নিতাম। বহু দুরারোগ্যে রোগীকে এই নাম চিকিৎসায় নিরাময় হতে যেমন দেখেছি, তেমনি আমি নিজেও এই চিকিৎসার দ্বারা দুই তিনটি রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কথা। কুষ্টিয়ার বহু অঞ্চলে কয়েক বৎসর নাম প্রচারের ফলে কুষ্টিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বহু নরনারী সৎ নামের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। সংকীর্তন ও সৎ আলোচনার মাধ্যমে ঐ সমস্ত নবীন দীক্ষিতদের ইষ্টানুসরণে প্রেরণা যোগাবার জন্য এবং ঐ অঞ্চলের সর্বত্র আরও ব্যাপক ভাবে নাম প্রচারের জন্য ঠাকুর কুষ্টিয়ায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই ইচ্ছানুসারে পরম ভক্ত ও শিষ্য সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের কলাবাগানের বাড়িতে এই আশ্রম স্থাপিত হয়। ঠাকুর তখন অন্তরঙ্গ পার্ষদ সতীশচন্দ্র গোস্বামীর উপর এই আশ্রম পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। আশ্রমে নিয়মিত প্রতিদিন ঠাকুরের সেবাপূজা, নামধ্যান, সদালোচনা ও সংকীর্তনাদি চলতে থাকে। আশ্রমে সকল সময়ই আনন্দোৎসব লেগে থাকত। ১০/১২ জন লোক সবসময় সেখানে বাস করত এবং প্রত্যহ দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে সমবেত হতেন সেখানে। এজন্য আশ্রম সবসময় খোলা থাকত।

সেকালে কুষ্টিয়ার পাঁচ মাইল দক্ষিণে গড়াই নদীর শাখা কালী গঙ্গার তীরবর্তী কমলাপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই গ্রামের ধনী জমিদার ভক্ত সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাসের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীঠাকুরের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ সতীশচন্দ্র গোস্বামীর মাধ্যমে ঠাকুরের কাছ থেকে আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করেন। ভক্তদের সবিশেষ অনুরোধে এবং নাম প্রচারের সুযোগ সুবিধার কথা বিচার বিবেচনা করে অবশেষে সতীশচন্দ্র গোস্বামীকে কলাবাগানের আশ্রমটিকে কমলাপুরে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। ঠাকুরের নির্দেশে আশ্রম কমলাপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং সতীশচন্দ্র সপরিবারে সেখানে বাস করে আশ্রমটি পরিচালনার ভার নেন। কলাবাগানের মতই এখানেও নিত্য পূজা অর্চনা, নাম ধ্যান সংকীর্তন, সদালোচনা ভক্ত সমাগম এবং আনন্দ উৎসব চলতে থাকে। সতীশচন্দ্র

গোস্বামী দিবারাত্র যাজন কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। নিত্য সংকীর্তন দল নিয়ে নগরের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে নামসুধা বিতরণ করে বহু নরনারীর তাপিত প্রাণকে শীতল করেন। এইভাবে আশ্রমের সেবাকার্যের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে সৎ নামে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। কিছুকালের মধ্যেই আশ্রমটি শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের আশ্রম নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কমলাপুরের আশ্রমটি যখন কলাবাগানে অবস্থিত ছিল তখন সেখানে একদিন কীর্তন শেষে ভোগ নিবেদনের সময় অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনা সত্যিই চমকপ্রদ। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আশ্রম আঙিনায় বহুভক্তের সমাগম হয়েছিল। সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন ঠাকুর হিমাইতপুরে ছিলেন। সেদিন ভোগদানকালে ভক্তরা সকলে গোস্বামী সতীশচন্দ্রকে ধরে বসলেন, বাবা, আজ-আপনাকে আমাদের বহু দিনের প্রাণের একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হবে। শ্রীঠাকুর স্বয়ং এসে ভোগ গ্রহণ করেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখে কৃতার্থ হতে চাই।

সতীশচন্দ্র বললেন, বেশ তো, তোমরা সবাই যদি তন্ময় হয়ে কীর্তনে মেতে উঠতে পার এবং আমাকেও মাতিয়ে তুলতে পারো তবে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ হবে। একান্ত মনে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া না দিয়ে কিছুতেই পারবেন না।

তখন ভক্তরা তুমুলভাবে কীর্তনে মেতে উঠল এবং সতীশচন্দ্রকেও মাতিয়ে তুলল। তাঁর তখন বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবার দশা। এই সময় সতীশচন্দ্র ভক্তিবিগলিত চিত্তে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করলেন।

এদিকে ঠাকুর তখন সন্ধ্যাকালে পদ্মার তীরবর্তী হিমাইতপুর আশ্রমে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ এক সময় ঠাকুর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলেন, কুষ্টিয়া যাওয়া লাগে, চল্ এক্ষুনি যাব। এই কথা বলেই ঠাকুর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন, ভক্ত সঙ্গীগণ তাঁর পিছনে ছুটতে ছুটতে তাঁর নাগাল পাচ্ছিলেন না। এমন দ্রুতবেগে ঠাকুরের ছুটে চলা তাঁরা কেউ কখনো আগে দেখেননি। কীভাবে তাঁরা এই শীতের রাতে আট-দশ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং পথের দুটি নদী পার হয়ে কুষ্টিয়ার কলাবাগানের আশ্রমে পৌঁছবেন তা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন কিন্তু কোন উপায় নেই, ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে।

অবশেষে ঠাকুরের ইচ্ছায় এবং কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হলো। রাত্রি ১১টার সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং পদ্মা ও গড়াই নদীর খেয়া পার হয়ে সঙ্গী ভক্তরা ঠাকুরকে নিয়ে কুষ্টিয়ার কলাবাগান আশ্রমে উপস্থিত হলেন। অকস্মাৎ ঠাকুরকে তাদের মধ্যে পেয়ে সমবেত ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল। গোস্বামী

সতীশচন্দ্রেরও বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না। তিনি যে ভক্তদের বলেছিলেন, প্রাণের আকুতি নিয়ে ঠাকুরকে ডাকলে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না তাঁর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

এদিকে ঠাকুর কীর্তন-আঙিনায় প্রবেশ করেই ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, বড্ড খিদে পেয়েছে, শীগগির খেতে দে।

ভক্তগণ তখন মহানন্দে অতিশয় ব্যস্ততার সঙ্গে ঠাকুরের পাদপ্রক্ষালন ভোজন ও আগমনের ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠাকুরের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পেয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন।

৯

তখন ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমগ্র বাংলাদেশ। এই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে ঠাকুর প্রবর্তিত হরিনাম সংকীর্তন ও সৎ নাম প্রচারের বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল সমস্ত দেশ। এমন সময় পুলিশের নজরে পড়ল ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলির উপর। পুলিশের ধারণা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এমন অনেক বিপ্লবী ঠাকুরের আশ্রমগুলির কোন না কোন একটির সঙ্গে যুক্ত। তারা ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য কীর্তনে মেতে ওঠে।

মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস ও মোক্তার বীরেন্দ্রনাথ রায় উভয়েই ছিলেন তৎকালীন কুষ্টিয়ার বিপ্লবীদের নেতা এবং স্বদেশী আন্দোলনের পাণ্ডা।

আবার তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও স্নেহভাজন ভক্ত। এঁদের গতিবিধির উপর পুলিশ সর্বক্ষণ কড়া নজর রেখে চলত। এমনকি ঠাকুরের দরবারে ও কীর্তন আসরে পুলিশ মোতায়েন থাকত। পুলিশ এই সন্দেহ করত যে ঠাকুর হয়তো বিপ্লবীদের কাজকর্ম সমর্থন করেন। তাই তারা ঠিক করেছিল ঠাকুরের হরিনাম সংকীর্তনের দলগুলি ভেঙে দেবে।

অবশেষে একদিন (১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২১ পৌষ) কুষ্টিয়ার ডি.এস.পি নিজেই উকিল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হন।

ডি.এস.পি ঠাকুরকে যথাবিধি সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন, দেখুন আপনাকে আমরা অতিশয় সজ্জন মহান ব্যক্তি বলে জানি, আপনার প্রতি আমাদের খুবই ভক্তি বিশ্বাস আছে, কিন্তু যারা আপনার কাছে যাতায়াত করে তাদের মধ্যে কয়েকজন পলিটিক্যাল

সাসপেক্ট বা সন্দেহভাজন বিপ্লবী আছে। আমাদের বিবেচনায় আপনার সঙ্গে তাদের মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করতে পারে।

ডি.এস.পি সাহেবের কথা শুনে ঠাকুর বিনীতভাবে বললেন দেখুন দাদা, আমার কাছে তো অনেক লোকই নিত্য যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে কে বিপ্লবী বা আপনাদের সন্দেহভাজন ব্যক্তি তা আমি কি করে জানব? আর তা যদি জানতেও পারি তাহলেও আমাকে ভালবেসে যদি তারা আমার কাছে আসে তবে কি করে আমি তাদের চলে যেতে বলতে পারি বা আমার কাছে আসতে নিষেধ করতে পারি? তাতে আমার ভাগ্যে যা থাকে তা হোক।

সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে এই সব কথাবার্তার পর ডি.এস.পি সাহেব চলে গেলেন। সেই থেকে পুলিশ ঠাকুর ও তাঁর কীর্তনদলের উপর কড়া নজর রেখে চলতে লাগল। কিন্তু পুলিশের লোকেরা ঠাকুরের আলাপ আলোচনা ও কার্যকলাপ বিচার বিবেচনা করে তাঁর প্রেমপ্রীতি, সরলতা, সততা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও চরিত্র মাহাত্ম্যের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেও তারা তাদের মধ্যে বিশেষ দোষ খুঁজে পেল না। তারা বুঝতে পারল ঠাকুরের মত প্রেমিক ও মহান ব্যক্তির প্রভাবেই তাদের জীবন ও চরিত্রের এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

পুলিশ তখন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নামের তালিকা থেকে অশ্বিনীকুমার ও বীরেন্দ্রনাথের নাম দুটি কেটে দিল। এই পুলিশদের মধ্যে অনেকে ঠাকুরের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মহিমা প্রচার করতে লাগল এবং সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীঠাকুরকে শ্রীশ্রীগুরু পদে বরণ করে ধন্য হলো।

সেকালে ঠাকুরের কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে জ্ঞানচন্দ্র বিশ্বাস নামে জনৈক পাদরী ও ঠাকুরের মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ে নানা আলাপ-আলোচনা চলত। ঠাকুরের উদার মতবাদ ও প্রেমভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন পাদরী সাহেব। একদিন এক সনির্বন্ধ অনুরোধের মাধ্যমে রাজি করিয়ে ঠাকুরকে জ্ঞানবাবু তাঁদের গীর্জার প্রাথনা সভায় যোগদানের জন্য নিয়ে গেলেন। সেই সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

গীর্জার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্র ঠাকুরের ভাববিকার দেখা দিল। স্থির নিস্পন্দ অপলক দৃষ্টিতে গীর্জার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি ভাববিহ্বল অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন এবং 'প্রভু যীশু' 'প্রভু যীশু' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ঠাকুরের এই মহাভাব দর্শন করে জ্ঞানবাবু ও উপস্থিত যীশু ভক্তগণ অতিশয় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হলেন। যীশুগতপ্রাণ ঠাকুরের চরণে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

অন্য একদিন (ইং ১৯১৭, ১২ ফেব্রুয়ারী) ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে নির্গত যীশু সম্পর্কিত বাণী শুনে কীর্তনে উপস্থিত জ্ঞানবাবু ও যীশুভক্তগণ আরও শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলেন ঠাকুরর প্রতি। কীর্তন করতে করতে সেই সময় ঠাকুরের ভাবসমাধি হয় আর সেই অবস্থায় ঠাকুরের মুখ থেকে যীশু বিষয়ক কতগুলি বাক্য বেরিয়ে আসে। তিনি বলেন, প্রেম; প্রেম; প্রেম। দুঃখ, কষ্ট যা কিছু আছে সব মুছে যাক, রক্তস্রাব বন্ধ হোক, বলুক প্রেম; প্রেম..শক্ত বিশ্বাস চাই নইলে কি হয়? ভালবাসাই জীবন তাই...যীশু অকলঙ্ক চরিত্র, তোমরা যীশুর পূজা করবে না ভাই? তখন কীর্তনে উপস্থিত জ্ঞানবাবু ও অন্যান্য যীশুভক্তরা ঠাকুরের যীশু প্রেম ও যীশুর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস দেখে বিস্মিত হলেন এবং তাঁর চরণে প্রণতি জানিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলেন।

একদিন হিমাইতপুরকে কেন্দ্র করে ঠাকুরের হরিনাম সংকীর্তন ও সৎ নাম প্রচারের আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের ধারা ক্রমে ক্রমে শতমুখী হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

বরৈচারা গ্রামের রাধারমণ জে'য়ারদার ঐ গ্রামে কীর্তন ও নাম প্রচারের এক বৃত্তান্ত কয়েকটি ঘটনাসহ নিখুঁতভাবে বিবৃত করেন।

তিনি বলেন, ১৩২৩ সনের ২৭শে চৈত্র। ঠাকুর তখন কুষ্টিয়ায় ছিলেন। একবার আমাদের বরৈচারা গ্রামে ঠাকুরের উপস্থিতিতে এক কীর্তনানুষ্ঠানের কথা হলো। ঐ দিন সকালে নটার ট্রেনে ঠাকুর, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস, সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মহারাজ অনন্তনাথ রায় এবং কুষ্টিয়ার কয়েকজন গণ্যমান্য উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রায় ৫০/৬০ জনকে নিয়ে আমি, আমার বড়দা সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ও আমার স্ত্রী বরৈচারা রওনা হলাম।

খোকসা স্টেশনে নামার পর ঠিক হলো ঠাকুর সমসপুর গ্রামে আশুতোষ ঘোষের বাড়ি হয়ে আমাদের বাড়ি যাবেন। এদিকে আমরাও অন্যান্য সকলে বরৈচারা রওনা হলাম এবং বেলা ১২টার সময় পৌঁছলাম। আমার মেজদা তখন সপরিবারে বাড়িতে থাকতেন।

শ্রীঠাকুর তাঁর ভক্তবৃন্দ নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসছেন শুনে আমার মেজদা দারুণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন ঠাকুর ভক্তবৃন্দ নিয়ে আমাদের বাড়ি আসছেন সে তো সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমাকে আগে থেকে একথা জানালি না কেন? এই ভরদুপুরে আমি এতগুলি লোকের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে করব। হাট ছাড়া গ্রামের মধ্যে তরিতরকারি কোথাও পাওয়া যায় না। খোকসা জানিপুরের বাজারও ৫/৬ মাইল দূরে, এমন অসময়ে আমি কী ব্যবস্থা করব।

মেজদা যখন এইসব অনুযোগ করছে, ঠিক তখনই ঠাকুর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নাম করতে করতে আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরকে একবার দর্শন করেই শান্ত হয়ে গেলেন মেজদা। আমি তখন তাঁকে বললাম দয়াল ঠাকুর যখন স্বয়ং উপস্থিত আছেন তখন চিন্তার কোন কারণ নেই। তাঁর দয়ায় সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনিই দয়া করে আমাদের মান রক্ষা করবেন। মেজদা একথায় বাড়ির ভিতরে মেজ বৌদির কাছে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল।

মেজবৌদি বললেন, বাড়িতে চাল ডালের অভাব হবে না। তবে তরিতরকারি ও ভদ্রলোকদের আহারের উপযোগী দই দুধ মিষ্টান্ন ঘরে নেই।

আমি বললাম ঘরে যা আছে তাই দিয়ে দয়াল ঠাকুরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে রান্নার কাজ আরম্ভ করুন। তারপর তাঁর ইচ্ছায় যা হবার হবে।

আমাদের বাড়ি সংলগ্ন পূজামণ্ডপে তখন কীর্তন শুরু হয়ে গেছে। গ্রামে বহুলোক এসে সেই কীর্তনে যোগ দিয়েছে। মহারাজ গোঁসাইবাবা ও কিশোরীদা তিনজনে মিলে প্রচণ্ড বিক্রমে কীর্তন পরিচালনা করছেন। বীরুদা পৃথক ঘরে ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত করার ভার নিয়েছেন এবং আমাদের রান্নাঘরে প্রায় দুশো লোকের রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি তখন কিছুক্ষণের জন্য কীর্তনে যোগ দেবার পর বৈঠকখানার দালানে কয়েকজন অতিথির সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় দেখলাম কয়েকটি লোক মাথায় তরিতরকারির ঝাঁকা নিয়ে সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের এত বেলাতেও দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল আজ বাজারে যেতে দেরী হয়ে গেছে বলে গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঐ সব মাল বিক্রী করব। আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে সব তরিতরকারি নিয়ে নিলাম।

কী আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই দেখি দুজন ময়রা ও দুজন গোয়ালা দু টিন রসগোল্লা ও দু ভাঁড় দুধ নিয়ে যাচ্ছে। আমি তখন তাদের কাছ থেকেও সব দই মিষ্টি কিনে নিলাম। দয়াল ঠাকুরের মহিমা দেখে আমি সত্যি সত্যি বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারলাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গে মেজদাকে গিয়ে জানালাম ঠাকুরের মাহাত্ম্যে সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন ঠাকুরের ভোগ যাতে যথাশীঘ্র সুচারু রূপে হয় তার ব্যবস্থা করুন। মেজবৌদিও আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারণ গ্রামে থেকে কোথাও না গিয়ে এত সব জিনিসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এ কথা তিনি ভাবতেই পারেননি।

আমি এবার কীর্তনে যোগদান করব বলে মনে ভাবছি। এমন সময় এক দীর্ঘাকৃতি হিন্দুস্থানী যুবক হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, কোমরে চাপরাশ ও মাথায় পাগড়ী, আমাদের

বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো, সে আমার কাছে এসে হিন্দী ভাষায় জানাল, তার মালিক এস্টেটের কাজে এগ্রামে এসেছে। তার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি তাকে বললাম, বাঙালী ব্রাহ্মণ রান্না করছে। ঠাকুরের ভোগ হবে। বহুলোক প্রসাদ পাবে এবং তুমিও প্রসাদ পাবে।

আমার কথা শুনে হিন্দুস্থানী যুবকটি বলল, সে বাঙালী ব্রাহ্মণের রান্না খায় না। তার জন্য পৃথক রান্নার ব্যবস্থা তখন সম্ভব নয় বলে আমি তাকে দুধ চিড়ে মিষ্টি খাবার অনুরোধ করলাম। সে তাতে রাজী হলো।

এরপর হিন্দুস্থানী যুবকটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মধ্যে ভাবের আবেশ ঘটে। সে তখন 'কোন হ্যায় বাঙালী গুরু' —এই কথা বলে নিজেই কীর্তনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুলভাবে কীর্তন ও নৃত্য করতে করতে একসময় ভাবে উন্মত্ত অবস্থায় যুবক মাটিতে পড়ে গেল এবং মৃগী রোগের মত হাত পা খিঁচতে লাগল। আমি তখন ছুটে গিয়ে তাকে সুস্থ করে তুললাম। পরে আঙিনায় বিছানা করে তাকে শুইয়ে দিলাম।

কীর্তনের পর সবাই বিশ্রাম করে স্নান করতে গেল। বীরুদা ঘরের দালানে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠাকুরের আহারাদি শেষ হলে সকলে ভোজনে বসল। আমি তখন বাইরের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম হিন্দুস্থানী যুবকটি স্নান করে বসে আছে। সে তখন নিজে থেকে তার প্রসাদ খাওয়ার ইচ্ছার কথা জানাল। আমি তখন তাকে ঠাকুর ভোগের প্রসাদ এনে দিলাম। বুঝলাম ঠাকুরকে দর্শন করে তার প্রভাবে লোকটির মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এই হিন্দুস্থানী যুবক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্টেটের হাবাসপুর কাছারীতে বরকন্দাজের কাজ করত। তার নাম ছিল রতনলাল। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সৎনামে দীক্ষিত হয়ে কুষ্টিয়ায় গিয়ে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে নাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

বহুকাল আগের কথা। রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার সঙ্ঘ ভ্রাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরের অনুমতিক্রমে আমাদের কীর্তনের দলটিকে ফরিদপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

একদিনের কথা। আমরা পতাকা হাতে নিয়ে কীর্তন করতে করতে প্রথমে সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করে স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। সেখানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভার ইষ্টভ্রাতা শ্রী শ্রীবরণ বসাক বি.এ. শ্রীপূর্ণ চন্দ্র কবিরাজ বি.এ. শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু বি.এল. শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দাস, শ্রীকিশোরী মোহন দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এদের বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সভাভঙ্গের পর শহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সৎ নামের দীক্ষা গ্রহণ করে।

এরপর আমরা ফরিদপুর রাজবাড়ি যাত্রা করি। পথে প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর সমাধি দর্শন করি এবং সেখানে কীর্তন করি। পথে যেতে যেতে এক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির গৃহের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর আগ্রহে আমরা তাঁর অন্দরমহলে গিয়ে তুমুল কীর্তন করি। কীর্তনশেষে ধনী ব্যক্তিটি আমাদের সকলকে এক পঙক্তিতে বসিয়ে দুধ চিড়ে মুড়কী সন্দেশ ক্ষীর প্রভৃতি পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান।

একদিন সকালে ভক্তগণ যখন প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় কীর্তন করতে করতে ফরিদপুর নগর পরিক্রমা করছিলেন তখন পথে এক মেথর ময়লার বালতি আর ঝাঁটা হাতে সেই কীর্তন দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই মধুর কীর্তন শুনে এবং কীর্তন ও নৃত্যরত ভক্তদের ভাবাবেশ দেখে মেথরের মধ্যেও ভাবাবেশ জাগল। সে তখন ময়লার বালতি মাথায় নিয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। বালতি হাতে ময়লার জল ছিটকে ভক্তদের গায়ে লাগল। কিন্তু ভক্তরা তখন কীর্তনের আনন্দে এমনই মাতোয়ারা যে, তারা এতে কিছুই মনে করল না। নামের প্রভাবে শুচিতা ও অশুচিতা সম্বন্ধে সব ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাদের। তথাকথিত হীনজাতি ও মেথরের সেদিন নামের প্রভাবে যে ভাবান্তর ঘটেছিল, তা দেখে নগরের অনেকেই বিস্মিত না হয়ে পারেনি।

নগর পরিক্রমার পর ভক্তগণ কীর্তন করতে করতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছু জলযোগের পর আবার কীর্তন শুরু হলো। তারপর কীর্তন শেষে ঠাকুর ও সৎনাম প্রসঙ্গে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। সেই সভায় অনন্ত মহারাজ তাঁর ভাষণে অনেক কিছু আলোচনা করলেন সৎনাম ও সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে। সেই সময় শহরের এক নামকরা ডাক্তার কেদারনাথ ভট্টাচার্য সবশেষে অনন্ত মহারাজকে তত্ত্বকথা আলোচনা করতে গিয়ে নানা কূট প্রশ্নের অবতারণা করলেন। তখন মহারাজ তাঁকে বললেন, দাদা, বহু দিন অনেক তর্ক-বিতর্ক করে এসেছেন। এবার একটু কাজ করেই দেখুন না, কী হয়। যদি সুফল না হয়, তবে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ। নাম নিতে বা ছাড়তে তো আর টাকা পয়সা লাগে না, কাজ না করে শুধু কথা বলে লাভ কি?

মহারাজের তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনে সেই ডাক্তার ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে তৎক্ষণাৎ সৎ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

এইভাবে ফরিদপুর রাজবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্রমাগত কীর্তন ও নাম প্রচারের ফলে স্থানীয় বহু লোক সৎ নামে দীক্ষিত হয়ে শ্রীঠাকুরকে গুরুপদে বরণ করে ধন্য হয়েছিল।

কুষ্টিয়ার বিশ্বগুরু উৎসবের পর শাক্যসিংহ সেন বি.এ. ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা 'ভূ-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থ রচয়িতা চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় কিছুদিন হিমাইতপুরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি ঠাকুরের সঙ্গে নানা তত্ত্বালোচনা করে বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হন। চমৎকৃত হন তাঁর চারিত্রমাহাত্ম্য দেখে। তারপর তিনি সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি সৎনামের মহিমা ও শ্রীঠাকুরের চরিত্রমহিমা ও ভাববাজির কথা কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহলে প্রচারের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন।

সেন মশাই হিমাইতপুর থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর কলকাতাস্থিত বাসভবনে একবার পদার্পণ করার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এই সময় ঠাকুর হরিণাকুণ্ডু, বরানগর, নৈহাটি প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করার পর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরেই চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় পুত্র শাক্যসিংহ সেন হিমাইতপুরের আশ্রমে এসে শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, অনন্ত মহারাজ, সুশীলচন্দ্র প্রভৃতিকে কলকাতায় তাঁদের কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাড়িতে নিয়ে যান। তখন ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের শেষভাগ।

চন্দ্রশেখর সেনের আমন্ত্রণে তাঁর বহু উচ্চশিক্ষিত বন্ধুবান্ধব, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে তাঁর বাসভবনে স্বাগত হন। সেখানে প্রায়ই এঁদের সঙ্গে ঠাকুরের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সম্পদ, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গভীর আলোচনা হত। এই আলোচনা কালে সমাগত সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঠাকুরের প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ মতবাদ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি তাঁর অপূর্ব প্রেমিক চরিত্রের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান তাঁরা।

শ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরাও তাঁদের পরিচিত মহলে ঠাকুরের অপূর্ব বৃত্তান্ত প্রচার করতে থাকেন। এইভাবে দেখতে দেখতে লোকমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে দর্শন ও তাঁর অমিয় মধুর বাণী শোনার জন্য সেন মহাশয়ের বাড়ি প্রতিদিন বহু নরনারীর সমাগম হতো। এঁদের মধ্যে অনেকে সৎ নামের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেবার ঠাকুর চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করার পর তাঁর হিমাইতপুর আশ্রমে ফিরে আসেন।

কিছুকাল পর শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আন্দামান থেকে ফিরে কিছুকাল ঠাকুরের হিমাইতপুর আশ্রমে অবস্থান করেন। ঠাকুরের উদার মনোভাব ও প্রেমিক চরিত্র, আশ্রমের সরল জীবনযাত্রা, প্রেম প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে প্রীত ও মুগ্ধ হন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়। এরপর তিনি কলকাতায় ফিরে

গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সুপ্রসিদ্ধ 'নারায়ণ পত্রিকায়' 'পাবনার মধুচক্র' নামক প্রবন্ধে ঠাকুর ও তাঁর সৎসঙ্গ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ তাঁর এই আলোচনা পাঠ করে কলকাতা ও মফস্বল অঞ্চলের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ঠাকুরের সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বারীন্দ্রকুমারের মুখে ঠাকুর সম্বন্ধে নানা বিষয়ে অবগত হন।

এই সময় ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার ঠাকুরের অবস্থানের জন্য ৭নং ঈশ্বর মিল বাইলেনের বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়। ঠাকুরের মা জননীদেবী অনন্ত মহারাজ, অশ্বিনী বিশ্বাস, সুশীলচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ ঈশ্বর মিল বাই লেনের বাড়িতে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের মাতুল ব্যারিস্টার জে.এন.দত্ত ও তাঁর স্ত্রী, কন্যা, সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতী বসু ও কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে ঠাকুরকে দর্শনের জন্য ঈশ্বর মিল বাইলেনের বাড়িতে আসেন। সেদিন জে.এন.দত্তের পত্নী দত্তমা ঠাকুরকে দর্শন করে ভাববিহ্বল অবস্থায় তাঁর নানা স্তবস্তুতি করতে থাকেন।

ঠাকুরের দিব্যকান্তি দর্শন করে ও তার কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে ওঠেন এই সব সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ। পরে সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব কটকের সরকারী উকিল জানকীনাথ বসু, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী কমলবাসিনী দেবী, কলকাতা মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাঃ শশীভূষণ মিত্র, বাগবাজারের ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এন্টালীর সুরেশচন্দ্র মুখার্জী, ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের রাজকর্মচারী নিবারণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ ঠাকুরকে প্রায়ই দর্শন করতে আসতেন।

১৯৩০ সালে ১/১ সি হরিতকী বাগান লেনের বাড়িটি শ্রীঠাকুরের অবস্থানের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। ঠাকুর যখন যেখানে অবস্থান করতেন সেখানে বহু লোক সমাগম হতো। ঠাকুরকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাবে বহু লোক সৎ নামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইভাবে সারা কলকাতা শহরে সৎসঙ্গীর সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। বেলেঘাটা, সিঁথি প্রভৃতি কলকাতার নানা অঞ্চল ও শহরতলিতে সৎসঙ্গের বহু শাখা স্থাপিত হয়। ঠাকুর যখনই কলকাতায় আসতেন তখনই জননীদেবী ও অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সব শাখায় উপস্থিত হয়ে নামগান ও নানা সদ্ আলোচনার দ্বারা স্থানীয় ভক্তদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

১৩২৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে ভক্তবৃন্দ সহ ঠাকুরের রাজশাহীর নওগাঁ পরিভ্রমণের পর ১৩২৭ বঙ্গাব্দে কিশোরীমোহন দাস সত্যনাম প্রচারের জন্য সেখানে যান। পাবনা নিবাসী জনৈক গোস্বামী মহাশয়ের নওগাঁয় অনেক শিষ্য ছিল। দুঃখের বিষয় এই গোস্বামী মহাশয় তাঁর নওগাঁর শিষ্যদের কাছে ঠাকুর সম্বন্ধে নানা নিন্দাবাদ করতেন।

এর জন্য সেইসব শিষ্যেরা ঠাকুরের প্রতি এক বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন।

কিশোরীমোহন নওগাঁয় যাবার পর একদিন তিনি সেখানে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য এক সভার আয়োজন করেছিলেন। এদিকে সেই গোস্বামী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ঐ জনসভা পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিশোরীমোহন একথা পূর্বেই জানতে পেরে হিমাইতপুরে ঠাকুরের কাছে সংবাদ পাঠান। ঠাকুর তখন এক তারবার্তার মাধ্যমে কলকাতা নিবাসী সতীশচন্দ্র বসুকে জানান। আপনি যতীনদাকে নিয়ে অনতিবিলম্বে নওগাঁ রওনা হোন।

সৌভাগ্যক্রমে যতীন্দ্রনাথ বসু যখন হাইকোর্ট থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন ডালহৌসী স্কোয়ারের কাছে সুশীলবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তাঁরা তখন উভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে সাড়ে পাঁচটার দার্জিলিং মেল ধরে রাত্রি সাড়ে দশটায় নওগাঁ পৌঁছান।

স্টেশন থেকে সরাসরি তাঁরা কিশোরীমোহনের দ্বারা অনুষ্ঠিত জনসভায় চলে যান। তাঁরা গিয়ে দেখলেন সভায় তখন কীর্তন চলছে। সে সময় পাবনার সেই গোস্বামী মহাশয় দলবল নিয়ে তাঁর দূরভিসন্ধি সাধনের জন্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সময় কিশোরীমোহন সভায় ঘোষণা করলেন, এইমাত্র কলকাতা থেকে দুজন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত এই সভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা ঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবেন আপনাদের সামনে।

·যতীনবাবু ও আরও কয়েকজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে কয়েকখানি ভক্তিমূলক গান গাইলেন। তারপর কীর্তন শুরু হল। সেই সব গান ও কীর্তন শুনে সভাস্থ শ্রোতারা এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে সে কীর্তন শেষ হলেও তাঁরা কীর্তন চালিয়ে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। সেদিন শ্রোতাদের মনোভাব দেখে গোস্বামী মহাশয় ও তাঁর দলের লোকেরা সভার কাজে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সাহস পেলেন না। সভাশেষে ঘোষণা করা হলো, পরেরদিন বিকালে স্থানীয় থিয়েটার হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সে সভার কীর্তন ও ঠাকুরের ভাব-ধারা সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা হবে।

পরদিন বেলা চারটের সময় থিয়েটার হলে সৎসঙ্গের সভা শুরু হলো। এদিন গোস্বামী মহাশয় সৎসঙ্গের সভাস্থল থেকে কিছুদূরে তাঁদের একটি সভা ডেকেছিলেন। সৎসঙ্গের সভা পণ্ড করে দেওয়াই ছিল তাঁর আসল অভিসন্ধি। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের সভার মাত্র কয়েকজন ছাড়া লোকজন মোটেই আসেনি। অথচ সৎসঙ্গের সভায় লোক-সমাগম এত বেশি হয়েছিল যে হলঘরের ভিতরে লোক সঙ্কুলান না হওয়ায়

বাইরে অনেকের বসার জায়গা করা হয়েছিল।

যথাসময়ে সৎসঙ্গের সভার কাজ শুরু হলো মঞ্চের উপর কীর্তন দলের লোকেরা ও বক্তারা আসন গ্রহণ করলেন। তারপর কীর্তন গান শুরু হলো সেই গানে পদের প্রথম দুটি পঙ্ক্তি ছিল—

হৃদ্‌মাঝারে দাঁড়াও এসে দয়াল ঠাকুর দয়াকরি
মনের সুখে রাখবো বুকে তোমার দুটি চরণতরী।।

এই গানের বাণী ও সুর এমনই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে এই গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাগণ সমস্বরে বলে উঠলেন 'আবার!' 'আবার!' এই শ্রোতাদের বারবার অনুরোধে এই গানটি তিন চার বার গাইতে হয়।

এরপর কিশোরীমোহন বক্তৃতা করতে উঠলেন। সেই সময় সেই গোস্বামী মহাশয় সভার একাধারে দাঁড়িয়ে ঠাকুর সম্বন্ধে নানা কটূক্তি ও নিন্দাবাদ শুরু করলেন। কিশোরীমোহন জোরাল কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভার বহু শ্রোতাও গোস্বামী মহাশয়ের নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করে তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন গোস্বামী মহাশয় অবস্থা বেগতিক দেখে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সভাস্থল থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর শিষ্যরাও তাঁদের গুরুর অনুসরণ করলেন।

সৎসঙ্গের উদ্যোক্তারা এইসব গোলমালের জন্য সভার কাজ স্থগিত রাখতে চাইলে সভার শ্রোতারা সভার কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে বারবার চাপ দিতে লাগল। ফলে সভার কাজ আবার শুরু করতে হলো। সেই সভায় সুশীলচন্দ্র বসু সুন্দরভাবে ঠাকুরের ভাবধারা নানা তত্ত্ব ও তথ্য সহকারে আলোচনা করলেন। এই আলোচনা শুনে সভার বিশিষ্ট শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। বক্তৃতার পর আবার একটি কীর্তন শুরু হল এবং এই কীর্তন শেষে সভা ভঙ্গ হলো।

সেদিনের সভায় ঠাকুরের ভাবধারার কথা শুনে শ্রোতাদের অনেকে শহরের মধ্যে সেই সব কথা বলাবলি করতে থাকেন। তা শুনে শহরের বহুবিশিষ্ট লোক ও সাধারণ মানুষ সৎসঙ্গের শিষ্য ভক্তদের কাছে এসে ঠাকুরের কাহিনী শুনতে চান এবং সৎ নামের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এর কিছুদিন পর নওগাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইচ্ছা ও অনুরোধ ক্রমে হিমাইতপুর থেকে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহারাজ অনন্তনাথ, কিশোরীমোহন ও সতীশচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি নওগাঁয় গিয়ে পুনরায় নাম প্রচার করেন। এই সময় নওগাঁয় সৎসঙ্গের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২২ সালের কথা। ঠাকুর তখন অসুস্থ অবস্থায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য পরিবার

পরিজন ও ভক্তবৃন্দ সহ কার্শিয়াং গিয়ে একমাসেরও অধিক সময় অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় ঠাকুরের নির্দেশে ভক্তগণ প্রতিদিন দুই বেলা হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে সমস্ত শহর ও শহরতলী পরিভ্রমণ করে নাম প্রচার করতেন। সেখানকার অধিবাসীরা সেই নামপ্রচারের প্রভাবে ঠাকুরের জনকল্যাণমূলক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠাকুরের অনুরাগী ভক্ত হয়ে উঠলেন। কার্শিয়াং-এ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি কনভেন্ট ছিল। ঠাকুরের ভক্তগণ প্রায়ই সেখানে গিয়ে পরম প্রেমময় যীশু ও ঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এর ফলে সেখানকার মিশনারীরা যীশু ও ঠাকুরের প্রেমময় ভাবধারার মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

কার্শিয়াং যাওয়ার আগে হিমাইতপুরে অবস্থানকালে ঠাকুর দুরারোগ্য এক কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। সে জ্বর ক্রমাগত একবছর ধরে চলতে থাকে। ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় বড় ডাক্তারকে দেখানো হয়। অনেক ডাক্তার ইতিমধ্যে রোগ ধরতে না পেরে ভুল চিকিৎসা করেন। অবশেষে তাঁকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য কার্শিয়াং-এ নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানেও রোগের কোন উপশম না হওয়ায় আবার তাঁকে কার্শিয়াং থেকে হিমাইতপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও রোগ উপশমের পরিবর্তে আরও বেড়ে যেতে থাকে। আগের চেয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়েন ঠাকুর। ডাঃ গোকুলবাবু কুষ্টিয়া থেকে প্রায়ই ঠাকুরকে দেখতে আসতেন। তিনি একদিন ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর, তুমি নিজে না চাইলে তোমার এ রোগ কেউ সারাতে পারবে না।

এই কথা শুনে ঠাকুরের আত্মীয়বর্গ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ঠাকুরের কাছে তাদের আকুল প্রার্থনা জানিয়ে বললেন, ঠাকুর, তুমি অন্তত আমাদের জন্য দয়া করে সেরে ওঠো।

ঠাকুর বললেন, যাওয়ার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে গেছে, আর ফিরবার উপায় নেই। তবে যদি আপনারা এই মন পরিবর্তন করে দিতে পারেন, তবে হয়তো রোগ সেরে যেতে পারে।

সেদিন থেকে অনন্ত মহারাজ অন্য সব ভক্তদের নিয়ে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নাম ধ্যানের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলার পর ঠাকুরের কি মনে হলো তিনি গোকুলবাবুকে ডেকে বললেন, আমাকে একটা ওষুধ দে।

গোকুলচন্দ্র বললেন, কি ওষুধ দেব?

ঠাকুর তখন একটি বায়োকেমিক ওষুধের নাম বললেন। গোকুলবাবু তৎক্ষণাৎ

সেই ওষুধ আনিয়ে ঠাকুরকে খাইয়ে দিলেন।

আশ্চর্যের কথা সেই ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরম পিতার কৃপায় ঠাকুর একেবারে রোগমুক্ত হয়ে গেলেন। অচিরেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি।

ঠাকুরের এই আশ্চর্যজনক রোগমুক্তির ঘটনা থেকে আমরা এই কথাই বুঝতে পারি যে পরম পিতার ইচ্ছার সঙ্গে ঠাকুরের ইচ্ছা যুক্ত হবার ফলে রোগমুক্ত হন ঠাকুর। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পরম পিতার মহাজাগতিক ইচ্ছার সঙ্গে যদি সামঞ্জস্য পূর্ণ না হয় এবং দুটি ইচ্ছা একাত্মভাবে মিলিত হতে না পারে তাহলে আমাদের কোন ইচ্ছা বা কামনা-বাসনা সফল হতে পারে না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ধর্মপ্রাণ পিতৃদেব কটকের সরকারী উকিল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু ও ভক্তিমতী জননী প্রভাবতী দেবী উভয়েই ছিলেন শ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত ভক্ত। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে ঠাকুর তাঁর পরিবারবর্গ এবং ভক্তবৃন্দসহ ১৩২৯ সনের ১৬ই পৌষ রবিবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বশেষ পুণ্য লীলাভূমি নীলাচলে গমন করেছিলেন। পুরীর সমুদ্রতীরে আর্মস্ট্রং রোডের উপর, 'হরনাথ' লজে ঠাকুর ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হয় এবং আশেপাশের আরও কয়েকটি বড় বাড়িতে ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কিছুদিন পর কিশোরীমোহন ও সতীশচন্দ্র গোস্বামী কীর্তনের দল নিয়ে পুরীতে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীক্ষেত্রের মত মহাতীর্থক্ষেত্রে শ্রীঠাকুরের পুণ্যময় সান্নিধ্যে অবস্থান করে পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় বঙ্গদেশ ও নানা স্থান থেকে ঠাকুরের ভক্তগণ পুরীতে গিয়ে উপনীত হন। ঐসময় ঠাকুর প্রায় দুই শতাধিক ভক্ত নিয়ে দীর্ঘ দেড়মাস ধরে পুরীতে বসু ধামে অবস্থান করেছিলেন।

এতদিন ধরে শ্রীঠাকুর ও তাঁর পরিবারবর্গের যথোচিত সেবা ও ভক্তদের প্রতিপালনের ব্যাপারে জানকীনাথ বসু সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের ভোজন শয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে যাতে কখনো কোন ত্রুটি না ঘটে তার জন্য তিনি সব সময় সব দিকে নজর রাখতেন। সে বিষয়ে তাঁর প্রচুর শ্রম ও অর্থব্যয় হলেও তিনি আনন্দে এই ভার বহন করে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করেছিলেন।

পুরীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে তাঁর ভক্তগণ প্রতিদিন সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর কয়েকটি ছোট ছোট কীর্তন দলে বিভক্ত হয়ে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ত। তাঁরা পুরীর মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে সব দলগুলিকে একত্রে মিলিত করে তাঁরা তুমুল ভাবে হরিনাম সংকীর্তন ও নৃত্য করতেন। জগন্নাথদর্শন করতে আসা অসংখ্য নরনারী ও মন্দিরের সেবকগণ সেই প্রাণউন্মাদনাকারী কীর্তন দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। সঙ্গে

সঙ্গে এক স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠত তাঁদের অন্তর। এইভাবে মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত কীর্তন ও নর্তনের পর ভক্তরা স্নানাহারের জন্য আপন আপন বাসায় চলে যেত।

ভক্তগণ কীর্তনের দল নিয়ে কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি নগরগুলিও পরিক্রমা করে সৎনাম প্রচার করেন। পুরীতে ঠাকুর যতদিন অবস্থান করেছিলেন, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বহু সাধারণ মানুষ ঠাকুরের দর্শন লাভ ও তাঁর বাণী শ্রবণের জন্য 'হরনাথ লজে' প্রায়ই সমাগত হতেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রার্থনা জানাতেন ঠাকুরের কাছে। প্রেমময় ও করুণাময় শ্রীঠাকুরও হাসিমুখে অকাতরে সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সব সমস্যার সমাধানের সূত্র বলে দিতেন। সে সূত্র সকলের কাছে আশ্চর্য ভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠত। সকলেরই মনে হতো তারা যেন তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব পেয়ে গেছে। তাদের পার্থিব ধনসম্পদ না থাকলেও এক আত্মিক তৃপ্তিতে ভরে যেত তাদের মন। সকলেই ঠাকুরের মধুর বচন সুধা পান করে ফিরে যেত আপন আপন বাড়ীতে।

পুরীতে অবস্থান কালে প্রায়দিনই ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে সমুদ্রস্নান করতে যেতেন। এই স্থানকে কেন্দ্র করে এই বিরাট মহোৎসব চলত যেন সমুদ্রসৈকতে। ঠাকুর সমুদ্র স্নানের জন্য সমুদ্র সৈকতে উপনীত হতেই চারদিক থেকে বহু বহু লোকের সমাগম হতো। তখন সমুদ্র সৈকতে ভক্তগণ খোল করতালসহ হরিনাম সংকীর্তন শুরু করে দিতেন।

তখন ঠাকুর স্নানের জন্য সমুদ্রে অবতরণ করে কীর্তনরত অবস্থায় ঢেউয়ের তালে তালে নৃত্য করতেন। তারপর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে কীর্তনের জলক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠতেন। সেই সঙ্গে কীর্তন, সমুদ্র তরঙ্গের তালে তালে দোলন, হাস্যকৌতুক, পরস্পরের প্রতি জল সিঞ্চন প্রভৃতি অনুষ্ঠান চলতে থাকত। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর এই শিক্ষাই দিতে চাইতেন যে ধর্ম জীবন থেকে আলাদা নয়। জীবনের প্রতিটি কর্মের সঙ্গে ধর্মকে এমনভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যে ধর্ম যেন কখনো মানুষের কাছে বোঝা বলে মনে না হয়। বরং তা যেন আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি কর্মকেই ছন্দ দান করে।

স্নানশেষে ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে পুরোভাগে নিয়ে কীর্তন করতে করতে বাসস্থানে ফিরে যেতেন।

একদিন ঠাকুর কাউকে কিছু না বলে একাকী খড়ম পায়ে বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্র সৈকতে চলে যান। তারপর আপন মনে সমুদ্র তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচ-ছ মাইল

দূরে সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে সাক্ষীগোপাল দর্শন করার পর চারদিকে ঘুরে ঘুরে দ্রষ্টব্যস্থান ও বস্তুগুলিকে দেখতে থাকেন। এইভাবে সেখানে তাঁর সারাদিন কেটে যায়। তারপর তিনি আবার পদব্রজেই ধীর গতিতে প্রত্যাবর্তন করতে থাকেন।

এদিকে কখন ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তা কেউ দেখতে পায়নি। তিনি কাউকে কোন কথা বলেনও নি। তাই বাড়িতে ও চারদিকে কোথাও তাঁকে না পেয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ভক্তরা। ঠাকুরের আত্মীয়বর্গরাও চিন্তিত হয়ে পড়েন।

তখন প্রধান প্রধান জ্ঞানী ভক্তদের নির্দেশে বাড়ির প্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হলো। তাঁরা বললেন, এই নাম, এই মহামন্ত্র। এই মন্ত্রশক্তি ঠাকুরকে এনে দেবেন। তিনি যেখানেই থাকুন, এখনি এসে পড়বেন। হলোও ঠিক তাই। কিছুক্ষণ নাম গান চলার পর দেখা গেল ঠাকুর কোথা থেকে এসে বাড়ির উঠোনে এক পাশে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন।

হারানো ঠাকুরকে সহসা ফিরে পাওয়ায় এক মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে ও চারদিকে। অবশেষে ঠাকুরও আনন্দের সঙ্গে সেই কীর্তনে যোগ দিলেন।

ঠাকুর একদিন জগন্নাথ দর্শন করতে গেলে পাণ্ডারা সম্ভ্রমভরে ঠাকুরের বিগ্রহ দর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অবশেষে ঠাকুর ১৯২৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পরিবার-পরিজন ও শিষ্যবর্গকে নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

১০

দেশের চারদিকে সৎনাম প্রচারের ব্যবস্থার পর ঠাকুর এক মহতী কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মানুষের সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর কর্মক্ষেত্রকে বিপুলভাবে প্রসারিত করে নানা কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন তার মধ্যে তাঁর এই বিশাল কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল তাঁর জন্মভূমি হিমাইতপুর। এই হিমাইতপুরে থেকেই তিনি এক আদর্শ পল্লী গঠন করার প্রথম প্রেরণা পান। শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে—মানুষের জীবন বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তা সবের ব্যবস্থা করে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তাঁর আদর্শ পল্লীকে।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করে এক ছাঁচে ঢেলে সকল ছাত্রকে একভাবে গড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষার মধ্যে

কোন প্রাণ নেই। এই শিক্ষাজীবন শেষ হলে ছাত্রেরা উপযুক্ত কর্মের অভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের মনে অশ্রদ্ধা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যতসব কুভাব ও কু প্রবৃত্তি জমে উঠতে থাকে। ঠাকুর এই সব বিবেচনা করে হিমাইতপুর আশ্রমে এক আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলেন যাতে ছাত্রেরা পুঁথিগত জ্ঞানবিদ্যা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কর্মশিক্ষা লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ঠাকুর এই আদর্শে বিদ্যালয়ের নাম দেন তপোবন বিদ্যালয়।

ঠাকুর দেখলেন আমাদের দেশের অতীত যতই গৌরবময় হোক সেই অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাল দিকগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, যদি আমরা অতীতের গৌরব মোহে অন্ধ থেকে পাশ্চাত্ত্য জাতির বিজ্ঞানের আধুনিক অত্যুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করি, প্রকৃতি সমুদ্র মন্থন করে নিত্যনতুন সত্যের আবিষ্কার দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে না পারি তবে মৃত্যু আমাদের অবশ্যম্ভাবী। জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ও অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে আমাদের অগ্রগামী হতে হবে। কোন বিষয়ে অন্য সব দেশের থেকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে কার্যকারিতার মধ্যে প্রয়োগ করে দেশের সম্পদ বাড়িয়ে অভাব দূর করার মানসে ঠাকুর তাঁর আশ্রমে এক বিজ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করেন। তার নাম দেন 'সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞান' কেন্দ্র।

এই বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনকালে ঠাকুরের হাতে কোন অর্থই ছিল না। তাঁর স্থানীয় ভক্তগণের হাতেও তখন বিশেষ অর্থ ছিল না। তাই ঠাকুরের পরিকল্পনার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন ভক্তগণ। অখ্যাত নগণ্য পল্লীতে কিভাবে এক বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা তাঁরা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারেননি। কিন্তু ঠাকুর একবার যা করার ইচ্ছা করেন তা বাস্তবে রূপায়িত না করে ছাড়েন না। এমনিই অনিবরেনীয় ছিল তাঁর সংকল্প, এমনিই দুর্দমনীয় ছিল তাঁর শক্তি ও তেজ। দেশের নানা স্থান ও অনুরাগী ধনী ভক্তদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করে কাজ শুরু করে দিলেন ঠাকুর। ক্রমে বনজঙ্গল কেটে এক বিশাল সৌধ নির্মাণ করা হলো। তারপর গবেষণার উপযুক্ত নানা যন্ত্রপাতি কিনে আনা হলো।

Projection microscope, X-ray apparatus, Microtone, Ultra microscope, Spectroscope, Gades Airpump, Galvanometer, Barometer, Chemical Balance, Radiophone, Beckman's apparatus, Hoffman's apparatus, Reflex condenser, Oil-filter, Filter press, Tincture Filter-press, Digester, Induction coil.

প্রভৃতি আরো বহু মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রে কক্ষগুলি সুসজ্জিত হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম পাকা বাড়ি না থাকায় ছোট ছোট কুটিরে গবেষণার কাজ চলত। পরে কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুরের ক্রমাগত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে প্রাচীর ঘেরা তিন বিঘা জমির উপর বড় বড় পাঁচটি কক্ষ ও প্রশস্ত বারান্দাসহ একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ি নির্মিত হল। অপর একটি বড় বাড়ির একতলায় অনেকগুলি কামরা নির্মাণ করা হল। এই সব কক্ষগুলিতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য চালাবার ব্যবস্থা করা হল। এই বাড়িরই দ্বিতলে গবেষণার বিষয়ক বইপত্র রাখার জন্য একটি গ্রন্থাগারও নির্মিত হয়।

ঠাকুর বলতেন বিশ্ববিজ্ঞানটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রাণপ্রিয় জিনিস, আশ্রমের জনকোলাহল থেকে দূরে এখানে এই নির্জন নিরালায় আপন মনে বিজ্ঞানের উচ্চ চিন্তা ও পরীক্ষাকার্য নিয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে। নানা গবেষণার চিন্তা নিয়ে ইচ্ছা করে এখানেই অধিকাংশ সময় কাটাই। বিজ্ঞানাগারটি কার্যোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ঠাকুরের চেষ্টার বিরাম ছিল না।

এরপর একটি টিনের চালার মধ্যে একটি হাপর ও কামারশালার কয়েকটি যন্ত্রপাতি নিয়ে সর্বপ্রথম সৎসঙ্গ মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস-এর কাজ শুরু হয়। এরপর ঠাকুরের ঐকান্তিক চেষ্টায় দুই বিঘা জমির উপর কারখানা গৃহ নির্মাণ করা হয়। এই বড় বাড়িটি আশ্রমের কর্মীগণই নির্মাণ করে। আশ্রমের পুরুষ ও মহিলা বাসিন্দারা, তপোবন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সকলে মিলে সারা দিন ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাজ করে বাড়িটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন করে। কারখানায় মেসিনের কলকব্জা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এবং গবেষণায় উপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য নানা আধুনিক ও উন্নত মানের যন্ত্রসমূহ আনা হয়। এখানে লেদের কাজ, দাঁত কাটার ও ছিদ্র করার কাজ, প্লেনিংয়ের কাজ, ঢালাইয়ের কাজ, সব ধরনের ঝালাইয়ের কাজ, কামারশালার কাজ, ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রভৃতির কাজ খুব উত্তমরূপে করা হতো। এছাড়া মোটর গাড়ির বেটারী প্লেট তৈরী, বেটারী মেরামত ও চার্জ করা, আরমেচার ওয়াইনডিং ডাইনামো মেরামত এবং ইলেকট্রিক ফিটিং প্রভৃতি কাজও করা হতো। কারখানার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহদাকার পাওয়ার হাউসও স্থাপন করা হয়। এখানে ৪৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট দুটি অয়েল ইঞ্জিন দিনরাত্রি চলে কারখানা, ছাপাখানা, লন্ড্রি, প্রভৃতি কার্যে এবং রাস্তায় তড়িৎশক্তি সরবরাহ করত।

কারখানার একদিকে দারুশিল্প বিভাগের কাজ চলত। এখানে আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় টেবিল চেয়ার আলমারী, আশ্রমের নবনির্মিত বাড়িগুলির দরজা জানালা

ও গৃহসজ্জার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরী হতো।

ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বনজঙ্গলে কত অদ্ভুত গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ ও গাছগাছড়া রয়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল উদ্ভিদ থেকে কত আশ্চর্য ফলদায়ক ওষুধ যে তৈরী হতে পারে তারও ইয়ত্তা নেই। এদেশের জলবায়ুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঐ সব ওষধিসমূহই আমাদের ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

নানা সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের বাণীর সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করার জন্য নানা গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে লাগল এই প্রেস থেকে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথিত এবং তাঁরই ভাবধারা অবলম্বনে অন্যের লিখিত গ্রন্থও এই সৎসঙ্গ প্রেস ও পাবলিশিং বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়ে দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। 'সৎসঙ্গী' পত্রিকাটি এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়ে প্রতি সপ্তাহে দেশবাসীর ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে অসংখ্য মানুষকে ঠাকুরের ভাবধারায় উদ্দীপিত করে।

এরপর ঠাকুর গ্রামের মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও অর্থাভাব দূর করার জন্য কুটীর শিল্প নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হন। কয়েক বছরের চেষ্টার ফলে ঠাকুর ময়দার কল, আটার কল, তেলের কল, চিনির কল এবং মেডিকেটেড এইরেটেড্, ওয়াটার, স্পাইস পাউডারিং, সূতার গুটি, গ্লাস ব্লোইং, টেলারিং, বোতাম নির্মাণ, লজেন্স বিস্কুট প্রস্তুতি এবং এই সঙ্গে কাডবোর্ড দ্বারা পিচবোর্ডের বাক্স নির্মাণের একটি কারখানা নির্মাণ করা হয়। এই সব কলকারখানায় গ্রামের বেকার যুবক ও দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের কাজে নিযুক্ত করা হতো। যাতে তারা গ্রামে থেকেই জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে পারে।

এরপর একটি স্টীম লন্ড্রী স্থাপন করার পর কটন ইণ্ডাস্ট্রির জন্য দুই বিঘা জমির উপর বড় বাড়ি নির্মাণ করা হয়। বাড়িটিতে কতকগুলি প্রশস্ত কক্ষ ও সামনে একটি প্রশস্ত বারান্দা ছিল। গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট মিল স্থাপন করে যাতে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করা যায় তাই আমাদের এ দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

বাংলা পল্লীর লতাগুল্মাদি থেকে অমৃত আহরণ করে দেশের যে কতখানি কল্যাণ সাধন করা যায় তা বিশেষভাবে প্রমাণ করার জন্যই ঠাকুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এর কারখানাটি পল্লীপ্রকৃতির ভিতরেই নির্মাণ করেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সৎসঙ্গে আসবার কথা ছিল। সেই বছরেই কারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঠাকুরের উপদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক ও চিকিৎসকরা এখানে টাটকা দেশীয় উদ্ভিজ্জ থেকে বিভিন্ন রকম ওষুধ প্রস্তুত করতে থাকেন।

এরপর ঠাকুর সৎসঙ্গ প্রেস ও পাবলিশিং হাউস প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর টিনের ছাউনীওয়ালা একটি বড় ঘরে আশ্রমের কর্মীদের নিয়ে ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করলেন। তারপর সঙ্ঘ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র বসুর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি আনালেন। কর্মীরা তখন ছাপাখানার কাজকর্ম কিছুই জানত না। ঠাকুরের অপূর্ব প্রেরণায় কর্মীগণ অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কম্পোজিং মেশিন চালনা প্রভৃতি ছাপাখানার যাবতীয় কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে উঠল। আশ্রমের মহিলারা কম্পোজিং-এর যাবতীয় কাজকর্ম করতো। সঙ্ঘের কাজকর্ম ছাড়াও বাইরের কাজও নেওয়া হতো। কিছুদিন পর বৈদ্যুতিক ফ্লাট মেসিন ও ট্রেডল মেসিনের ব্যবস্থা করা হলো। তাতে ছাপার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে লাগল। প্রেসের কাজের সঙ্গে বই বাঁধাইয়ের কাজও শুরু হলো। এবং গ্রামীণ শিল্পের যাতে উন্নতি করা যায়, সেটাই ছিল ঠাকুরের উদ্দেশ্য। এরপর 'অনুকূল হোসিয়ারী' নামে একটি গেঞ্জির কলও স্থাপন করা হয়।

ঠাকুর বলতেন, জীবনে বাঁচার আনন্দ ও ইষ্ট প্রতিষ্ঠার উল্লাস উপভোগ করতে হলে সু-স্বাস্থ্যের একান্ত প্রয়োজন। মানুষকে বাঁচাতে হলে ও সমাজের সেবা করতে হলে যেমন শিক্ষা শিল্প বিজ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন, বরং স্বাস্থ্যের প্রয়োজনই প্রধান। কারণ স্বাস্থ্যই ঐশ্বর্য।

গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠাকুর বরাবরই বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন এবং তাদের স্বাস্থ্যোন্নতির কথা প্রায়ই ভাবতেন। তাঁর চিকিৎসক জীবনে কখনও কোথাও কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তিনি প্রাণের আশঙ্কা ছেড়ে দিয়ে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ঠাকুর দেখলেন মহামারীর মূল কারণ হচ্ছে পানীয় জলের একান্ত অভাব। সেকালে গ্রামের মানুষরা নদী পুকুরের জল পান করত। তাই প্রায়ই তারা কলেরা, উদরাময়, আমাশয় ও বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করত। ঠাকুর তাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বহু গ্রামে নলকূপের ব্যবস্থা করলেন। আশ্রমবাসী ও গ্রামবাসীদের রোগ চিকিৎসার জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক ও একটি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় নিজ চেষ্টায় স্থাপন করলেন।

প্রতিবছর এখানে হাজার হাজার রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা ও যত্ন সহকারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো। প্রয়োজন হলে আশ্রমের কর্মী ডাক্তারগণ রোগীর বাড়ি গিয়ে বিনা ভিজিটে রোগ পরীক্ষা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে আসত। সৎসঙ্গ ধাত্রী-বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণীরা গ্রামস্থ প্রসূতি সাধারণের নিশ্চিন্ত ও সুখ প্রসবের ব্যবস্থা করতেন।

সৎসঙ্গের বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্মে যতই উন্নতি হতে লাগল, ততই নানা স্থান হতে কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। এদের অনেককে নিয়ে একটি পূর্ত বিভাগ

খোলা হলো। এই সব কর্মীরা বিভিন্ন গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধার জন্য নলকূপ খনন কার্য আরম্ভ করল। নলকূপ থেকে যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় তার জন্য উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটি ও জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করল। ক্রমে ক্রমে ঘর বাড়ির লোহার স্ট্রাকচারাল্ ওয়ার্কস, ওয়াটার ওয়ার্কস, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি সব ধরণের কন্ট্রাক্টরের কাজই এই বিভাগের কর্মীরা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে লাগল।

প্রতিবছর বহু শিক্ষিত বেকার যুবক নানা স্থান থেকে এই বিভাগে শিক্ষানবিশীর কাজ করে অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে হাতেকলমে কাজ করার কৌশল ও অভিজ্ঞতা অর্জন করল। এইভাবে বেকার যুবকদের অন্নসংস্থানেরও একটা উপায় হলো। পাকসীর সারা সেতু এবং গড়াই সেতুর River boring-এর কাজে এরা কর্ত পক্ষের খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কার্যকালে কোন সমস্যা দেখা দিলে এই সব কর্মী ঠাকুরের কাছে এসে সেই সব সমস্যা সমাধানের উপায় জেনে নিত।

দেশের লুপ্তপ্রায় কলাবিদ্যার পুনরুজ্জীবনের জন্য ঠাকুর আশ্রমের মধ্যে কলাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। এই বিভাগের কর্মীগণ ঠাকুরের কাছ থেকে চিত্রশিল্পের নানা অভিনব পরিকল্পনা ও তা কার্যকরী করার কৌশল শিখে নিতেন। দেখতে দেখতে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলাভবনটি নানারকম মনোরম চিত্রে শোভিত হয়ে ওঠে। কলাভবনটিতে একটি আলোকচিত্র ও একটি মৃৎশিল্প বিভাগও খোলা হয়েছিল। এই কলাকেন্দ্রে সসপেন্টিং-ওয়াটারকালার, এনলার্জমেন্ট, অয়েলপেন্টিং, কমার্শিয়াল ডিজাইন এবং মাটির তৈরী দেবদেবীর মূর্তি, ব্যক্তি বিশেষের অবিকল আকৃতি, খেলনা প্রভৃতি তৈরী করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হতো। শ্রীঠাকুরের নানা বয়সের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ধরণের ফটোচিত্র এখানে বিক্রয়ের জন্য রাখা হতো। সূচিশিল্পের নানাপ্রকার অতি মনোরম ছবি ও দৃশ্যাবলী সবসময় এখানে প্রস্তুত থাকত। মহিলাদের হাত দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে এমন সব সুন্দর সুন্দর কাজ করা হয়েছে যে অনেকে সেই সব কাজের শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছে।

কলাভবনটির আয়তন কাজের অনুপাতে তেমন প্রশস্ত না হওয়ায় এতে কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছিল। এজন্য ঠাকুর বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রের পূর্ব দিকে গাছপালায় ঘেরা এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নির্জন স্থানে বৃহদায়তন এক আর্ট স্টুডিও নির্মাণ করে দেন।

আনন্দবাজার হলো সৎসঙ্গের সাধারণ ভোজনাগার। পূর্বে যখন শিষ্য সংখ্যা কম ছিল তখন সমাগত শিষ্য ও ভক্তগণ দু-চারদিন ঠাকুরবাড়িতেই থাকতেন এবং সেখানেই ভোজন করতেন। ক্রমে শিষ্যদের সংখ্যা যখন বাড়তে লাগল এবং যখন তারা স্থায়ীভাবে

বাস করতে লাগল তখন তাদের আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হলো। এই কারণে আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠা হয়। শোনা যায় মনোমোহিনীদেবী পুরী থেকে ফিরে এসে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের আনন্দবাজারের নাম অনুসারে সৎসঙ্গের এই সাধারণ ভোজনাগারের নাম দেন·আনন্দবাজার।

শ্রীঠাকুরের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। সামান্য কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। তিনি সব সময় সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত থাকায় অর্থ উপার্জনের কোন উপায় ছিল না। এমত অবস্থায় ঠাকুরকে প্রতিদিন শতাধিক লোকের আহারের ব্যবস্থা করতে হতো। সামান্য এক অল্পবৃত্ত গৃহস্থের বাড়িতে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। তার উপর তিনি নানা কর্ম প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আরম্ভ করেছেন। লোকের কাছে অর্থ ভিক্ষা করে এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে হতো। সেই সঙ্গে আনন্দবাজারের কাজও চালাতে হতো। সে সময় আন্দবাজারে আউসের সবচেয়ে কম মূল্যের মোটা চালের লাল ভাত, পদ্মার ঘোলা জলের মত ডাল ও কিছু লবণ দিয়ে সকলের একবেলা আহার সারা হতো। যে দিন কিছু তরিতরকারির ব্যবস্থা হতো সেদিন সকলের স্ফুর্তির সীমা থাকত না। এক একদিন রান্না চাপাতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যেত। প্রতিদিন ঠাকুর অর্থ ভিক্ষা করে এনে চাল ডালের ব্যবস্থা করতেন। সকলের সঙ্গে তিনিও সারাদিন অনাহারে থেকে অম্লানবদনে কাজ করে যেতেন।

একবার সেকালের কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী আশ্রমে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ভোজনের জন্য বিশেষ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতিদিনকার সাধারণ খাদ্য খেতে চাইলেন। খেতে বসে এক কংগ্রেস নেতা বললেন এর চেয়ে আমরা ভাল খাবার পেয়েও জেলের মধ্যে অনশন করেছি। কিন্তু এখানকার কর্মীরা কাজ করে প্রাণের একান্ত টানে, তাই এখানে কোন অনশন নেই। যা পায় তাই তারা হাসিমুখে খেয়ে নেয়।

ঠাকুর বলতেন, পল্লীর কথা যখন ভাবি, প্রত্যেকটি পরিবারের ব্যথা বেদনার চিত্র যেন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয় আমিও ঐ পরিবারের একজন, তাদের অবনতির জন্য আমি দায়ী।

পল্লীর দুরবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুর আরও বলেন, বাংলার কৃষক ও শিল্পীদের কী দুরবস্থা! দেশে কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকার প্রভৃতির ব্যবসা আজ এক প্রকার লোপ পেতে বসেছে। দরিদ্র কৃষকেরা নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে কাল কাটাচ্ছে, কৃষি বা শিল্পের জন্য যখন তাদের অল্প কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয় তখন তারা ধনী মহাজনদের কাছে গিয়ে অর্থ ঋণ চায়। আর কুসীদজীবী মহাজন উচ্চহারে সুদে টাকা ধার দিয়ে তাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দেয়। গ্রামের সাড়ে পনের আনা লোক কৃষি ও শিল্পজীবী

এবং এই শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে পড়ায় গ্রামগুলি আজ ধ্বংসের মুখে।

পল্লীর কৃষক ও শিল্পীদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য শ্রীঠাকুর নিজ গ্রামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। কৃষকদের কৃষিকার্য ও শিল্পীদের ব্যবসা চালাবার জন্যে অল্প সুদে এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঋণগ্রহীতা নগদ টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে কৃষি বা শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে সে-ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হতো। আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও কিছু কিছু অর্থ বাঁচিয়ে যাতে দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করতে পারে গ্রামবাসীরা তার জন্য 'সৎসঙ্গ রিনোভেশন' নামে একটি ফাণ্ড খোলা হয়।

নারী জাতির সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের জন্য ঠাকুর আশ্রমের মধ্যে একটি মহিলা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজে মাতৃজাতির উন্নতির কথা কম চিন্তা করেননি ঠাকুর। এই অশিক্ষিত কুশিক্ষাপ্রাপ্ত, আদর্শচ্যুত সমাজের নারীকূলকে শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্র ও ব্যবহারে আদর্শ নারী করে তোলার কথা দিবারাত্রি ভাবতেন ঠাকুর। তিনি চাইতেন নারী জাতির জননী, এই বোধ যেন সদাসর্বদা জাগ্রত থাকে নারীদের মনে। মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্য, ধর্ম, শিক্ষা, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ তথ্য প্রচার, বিভিন্ন কুটীর শিল্পের মাধ্যমে নারীজাতিকে স্বাবলম্বী করে তুলে তাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। সেবাও রোগের প্রতিকার বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ধর্মভাব ও নীতিবোধ জাগ্রত করাই ছিল মাতৃসঙ্ঘ স্থাপনের উদ্দেশ্য।

ঠাকুর দেখলেন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূমায়িত বিরোধ বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। এই ধূমায়িত বিরোধই মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ডে ফেটে পড়ে। অথচ প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে এক সনাতন ঐক্য নিহিত আছে সমগ্র দেশ ও জাতির উন্নতি করতে হলে এই ঐক্যের ভিত্তিতে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে এক জীবনাদর্শ সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই আদর্শের পতাকা তলে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান বিভিন্ন ধর্মের লোককে সম্মিলিত করতে পারলে এক ধর্মের লোক অন্য কোন ধর্মের প্রতি কোন রূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না। কেউ কাউকে হিংসা করবে না। সকল ধর্মের লোক মিলে মিশে কাজ করতে পারলে অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সারা দেশ।

ঠাকুরের এই চিন্তা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠল। ঠাকুরের অসাধারণ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ও প্রেমাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মগত বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ঠাকুরের কাছে ছুটে এসে এক বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ এক সত্যিই অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ঘটনা।

সকলেরই দীর্ঘকাল ধরে শোষিত অন্ধ কুসংস্কার ও ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হওয়ায় মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল তারা।

ঠাকুর সৎসঙ্গে যে সব আদর্শে কর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন তা একে একে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠতে লাগল। দেশের লোক বুঝতে পারল বাংলার গ্রামে গ্রামে এইরকম আদর্শ শিক্ষায়তন, বিজ্ঞানাগার, চিকিৎসালয়, কুটীর শিল্প ও কলকারখানা প্রভৃতি গড়ে তুলতে না পারলে এবং অসংখ্য বেকারদের কর্মে নিযুক্ত করতে না পারলে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কোন কালেই সম্ভব হবে না। কারণ ভারতবর্ষ মূলত গ্রামপ্রধান দেশ। তাই গ্রামগুলি উন্নতির অভাবে সব দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলে জাতির অগ্রগতি কখনোই সম্ভব হবে না।

যাতে ঠাকুরের জনকল্যাণকর কর্মসূচী ও ভাবধারা সারা বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামে গ্রামে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সাধারণ মানুষকে ইষ্ট স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে তার জন্য ঠাকুর যোগ্য কর্মীগণকে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্রেরণ করলেন। এইসব কর্মীগণকে বাজক ও ঋত্বিক নামে অভিহিত করে শুধু বাংলার বিভিন্ন জেলায় নয়, বিহার ও ব্রহ্মদেশেও প্রচার কার্যে প্রেরণ করতে লাগলেন।

এক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর মত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীঠাকুর প্রথমে বুঝতে পেরেছিলেন আদর্শ বিবাহপদ্ধতির অভাবে দেশে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করছেন না। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন বৈশিষ্ট্যানুরাগী শিক্ষাপদ্ধতির অভাবে দেশে বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের জন্যই প্রতিটি পরিবারে স্বার্থপরতার বীভৎস লীলা চলছে। আর্থিক নিরাপত্তার জন্য পরিবারের প্রতিটি সদস্য ভীষণভাবে কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এই সব সমস্যাগুলি একত্রিত হয়েই সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে পরিপুষ্ট করে তুলছে। ঠাকুর প্রেরিত যাজকগণের প্রচার কার্যের ফলে দেশ বিদেশের লোক ঠাকুরের এই মহান ভাবধারা ও জীবনাদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল এবং ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল।

প্রচারকার্যে নিযুক্ত কর্মী ও যাজকগণ যাতে প্রতিটি গ্রাম ও শহরে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে মিশে তাদের দুঃখ ও ব্যথাবেদনার কথা সহানুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে এবং সেবার দ্বারা প্রয়োজনীয় সাহায্যাদি দান করতে পারে, তার জন্য ঠাকুর তাদের নিয়মিত উপদেশ দান করতে থাকেন।

এই সব কর্মী ও যাজকগণ যাতে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুচারুরূপে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন এবং সময়কালে তাঁরা যাতে উপযুক্ত সাহায্য লাভ করতে পারেন তার জন্য ঠাকুর সৎসঙ্গের 'ফিলানথ্রফি' নামে এক স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

সৎসঙ্গের বিভিন্ন বিভাগে যে সব কর্মী কাজ করতেন তাঁরা একান্তভাবে ঠাকুরের আদর্শে অনুরাগী ও অনুপ্রাণিত হয়েই এই কর্মে যোগদান করেন। অর্থলাভের প্রতি তাঁদের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ন্যূনতম ভরণপোষণের বিনিময়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে আপন আপন মনপ্রাণকে উৎসর্গ করে ঠাকুরের জনসেবার অত্যুজ্জ্বল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এজন্য তাঁরা সারা দিন ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন এক নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতেন।

সকাল হতেই আশ্রমের কর্মীবৃন্দ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে ঠাকুরের সামনে অনুষ্ঠিত এক প্রার্থনাসভায় যোগ দিতেন। প্রার্থনা চলাকালে ঠাকুর হিন্দী মঙ্গলাচরণ ও বিনতী স্তোত্র পাঠ করে সকলের মনকে ভক্তিভাবে উদ্দীপিত করে তুলতেন। প্রার্থনা শেষে সকলে এক ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ইষ্ট আরাধনা করতেন।

প্রার্থনা সভার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে কাজকর্মের এক তুমুল সাড়া পড়ে যেত। তপোবন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা মাচা, বেদী, বারান্দা বা ঘাসের উপর বসে ছাত্রদের গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্যের শিক্ষা দান করতেন। চিকিৎসক ডাক্তারখানায় অসুস্থ রোগীর রোগ পরীক্ষা করে তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিতেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মপ্রবাহ দ্বিগুণ বেগে চলতে থাকত। পাওয়ার হাউসের তড়িৎ শক্তির সাহায্যে কারখানা, প্রেস, কুটীর শিল্প বিভাগের কাজও জোর কদমে চলতে থাকে। মহিলা ও বালিকাদের নানারকম শিক্ষার ক্লাস বসে গেল। কোথাও সেলাই, কোথাও চিত্রাঙ্কন, কোথাও স্কুল ও কলেজের পাঠ চলতে লাগল। ব্যাঙ্কের গৃহে কর্তৃপক্ষ গ্রামের কৃষকদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। কেমিক্যাল ওয়ার্কসের এক অংশে ওষুধপত্র তৈরী হতো এবং অন্য অংশে তা দেশের বিভিন্ন স্থান ও বিদেশে পাঠানোর জন্য পার্সেলে প্যাক করা হতো।

দুপুরে আহারাদি ও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার যে যার কাজকর্মে রত হয়ে পড়ত। সম্পাদকগণ প্রবন্ধ লেখার কাজে মনোনিবেশ করতেন। বিজ্ঞানাগারে গবেষণার কাজ পুরোদমে চলতে থাকতো। অপরাহ্ণ হলেই সকলে আবার ঠাকুরের প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা খেলার মাঠে খেলাধূলায় মত্ত হয়ে উঠত। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন জায়গায় গান বাজনার আসর বসত। রাত্রি অধিক হলে শিক্ষক ও ছাত্রগণ নিবিষ্ট চিত্তে পড়াশুনোয় মগ্ন হয়ে পড়ত। অনেকে আবার পদ্মার ধারে গিয়ে গল্পগুজব ও আলাপ আলোচনা করত। বিশ্রামাগারে আশ্রমের সুশিক্ষিত কর্মীরা বাইরের অতিথি ও আগন্তুকদের সঙ্গে ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে

আলোচনা করতেন। সাধন গৃহে বসে কেউ কেউ ধ্যান করতেন। অভিনয় গৃহে শ্রীঠাকুরের ভাবধারা অবলম্বনে কর্মীদেরই স্বরচিত কোন নাটকের মহড়া চলত অধিক রাত্রি পর্যন্ত।

অবশেষে কর্মক্লান্ত কর্মীরা কেউ বা পদ্মার ধারে, কেউ বা বারান্দায় বা গৃহের ভিতরে, কেউ বা প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর ছোট ছোট বিছানা পেতে শয়ন করে নিদ্রা যেতেন।

১১

তখন ১৯৪৬ সাল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকালের শেষ পর্ব। এই বছর ১৬ই আগস্ট কলকাতায় এক বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। সেই হাঙ্গামা বাড়তে বাড়তে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এক বীভৎস আকার ধারণ করে। সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার নারকীয় লীলার প্রবল স্রোতে সারা দেশের স্বাভাবিক কাজকর্মের ও জনজীবনের ভিত্তিমূল বিপর্যস্ত হয়।

দীর্ঘকাল ধরে আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ঠাকুরের দেহের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। তার উপর মনে কখনো চিন্তার কিছু মাত্র বিরাম ছিল না। অসংখ্য অতিথি অভ্যাগত দর্শনার্থীদের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রায়ই চিন্তায় পীড়িত হয়ে উঠত তাঁর মন। দেহ মনের উপর ক্রমাগত চাপ পড়ার ফলে ঠাকুরের শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়তে থাকে। রক্তের চাপ, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে ভুগতে থাকেন তিনি। ঠাকুরের হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসক, আত্মীয়স্বজন ও শুভার্থীগণ ঠাকুরকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং পরামর্শ শেষে ঠাকুরও মেনে নেন।

তখন কৈলোর-এ একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। কিন্তু ঠাকুর স্বয়ং বিহারের অন্তর্গত দেওঘর বা বৈদ্যনাথ ধামে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে বৈদ্যনাথ ধাম যাওয়াই স্থির হয়।

তখন সঙ্ঘভ্রাতারা বৈদ্যনাথ ধাম যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে থাকেন। দেওঘরের রোহিনী রোডস্থিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণযুক্ত একটি দ্বিতল বাড়ি ঠাকুরের বাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। এই বাড়িটির নাম 'বড়ালবাংলা'।

অবশেষে ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, প্রাতে বেলা ১১টায় ঠাকুর পরিবারবর্গ

ও কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে বৈদ্যনাথ ধাম যাত্রা করেন। পরদিন বেলা ১২টায় ঠাকুর স্বপরিবারে দেওঘর পৌঁছে পূর্বনির্দিষ্ট বড়াল বাংলা নামক বাড়িটিতে গিয়ে উঠলেন। সেই থেকে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত শ্রীঠাকুর ঐ বাড়িতেই বাস করতেন।

অনেকের ধারণা ঠাকুর স্বাস্থ্যের কারণে পাবনা ত্যাগ করে বৈদ্যনাথ ধামে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে দেশ ভাগের ফলে পাবনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঠাকুর আর সেখানে যাননি এবং বৈদ্যনাথ ধামেই রয়ে যান। কিন্তু ঠাকুরের কথাবার্তা ও কর্মধারার আদ্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। ঠাকুর তাঁর প্রজ্ঞাবলে বাংলার ভবিষ্যৎ কী হবে তা একবছর আগেই জানতে পেরেছিলেন। সে কালের উদ্ভুত অপ্রীতিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সংখ্যালঘুত্ব ও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ ভাগের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাবের কথা সেকালের বিশিষ্ট দেশনেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও এন.সি. চ্যাটার্জিকে জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে কোন ফল হয়নি। এ বিষয়ে তিনি নেতাদের সৎবুদ্ধি ও পরামর্শ দেন। সেকথা অনেকেই জানতেন। কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতার ফলে দেশ ভাগ রোধ করতে না পেরে ঠাকুর শেষে কেবলমাত্র পাবনা জেলাটিকে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশভাগের কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় হিন্দু জমিদারেরা ঠাকুরের এই কাজে বিরোধিতা করায় ঠাকুরের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অবশেষে সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ঠাকুর মনের দুঃখে তাঁর শৈশবের লীলাভূমি ও যৌবনের সাধন ক্ষেত্র যে হিমাইতপুর গ্রামে ছিল নানা দিক দিয়ে ভারতের গৌরব, সেই হিমাইতপুর গ্রাম ও সৎসঙ্গ মহাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

হিমাইতপুর ত্যাগ করে চিরদিনের মতো বৈদ্যনাথ ধামে চলে আসতে যে নিদারুণ মনোকষ্ট পান ঠাকুর সে কথা পরবর্তীকালে আলোচনা প্রসঙ্গে খেদের সঙ্গে ব্যক্ত করেন ঠাকুর। একদিন কথায় কথায় তিনি বলেন, চেষ্টা করেছিলাম প্রাণপণ যাতে হিমাইতপুর ছাড়তে না হয়, কিন্তু অত্যাচারিত হলাম ভীষণ। পারলাম না কিছুতেই। বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল, মানুষ খুন করে ফেলল। ওখানকার সব লোকের বিরুদ্ধতার জন্য পারলাম না। সকলের ভাল করতে গিয়ে আমি একেবারে জাহান্নামে গেলাম।

একদিন ঠাকুর বলেছিলেন আমরা হিন্দুরাই পাকিস্তানের স্রষ্টা। আমরা আরও চেষ্টা করেছি যাতে আমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাই। আমরা মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে পারি না কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর আর একদিন বলেছিলেন, দেখা যায় রঘুনন্দনের সময় থেকে হিন্দুদের মুসলমানদের

মেয়ে বিয়ে করার যে প্রথা ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল, তা বোধ হয় মুসলমান নবাবের প্ররোচনায় রঘুনন্দন চালু করে গিয়েছিলেন, আর তখন থেকেই দৈহিক সমুন্নতি বন্ধ হয়ে গেল। এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই শারীরিক পতন শুরু হল। তার আগে তো দেখা গিয়েছে যে হিন্দুরা মুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করতো। শিবাজীর সময় বাজীরাও নামে একজন বড় মারাঠা সেনাপতি অনেক মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছিল। তাছাড়া অনেক বড় বড় রাজা ছিলেন, তাঁরা মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করতেন। শিবাজীর একজন বড় সামন্ত পেশোয়া মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। প্রতাপসিংহের ভাই শক্তসিংহও মুসলমান বিয়ে করেছিলেন। আমরা যাতে পাকিস্তান হয় বাস্তব-সম্মত সেই ব্যবস্থাই করেছি। আর যাতে পাকিস্তান না হয় সে ব্যবস্থা করিনি। তখন কতো লোক দেশ ছেড়ে আসছে ও যাচ্ছে। আগে যদি হায়দ্রাবাদের দিক থেকে হিন্দুদের আনা হতো তবে পাকিস্তান হতো না। কিন্তু তা তো হলো না। পাকিস্তান হওয়ায় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই কী ক্ষতিই না হলো। হিন্দুরা চলে আসায় মুসলমানদের কী লাভ হয়েছে? হিন্দু কালচার ও মুসলিম কালচারের মধ্যে তো কোন পার্থক্য নেই। উভয় সম্প্রদায়ের প্রফেট্সরা তো সেই এক অদ্বিতীয়েরই বার্তাবাহী।

আর একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। আর হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ৭৩ লক্ষ। হিন্দুর সংখ্যা মাত্র ৫৭ লক্ষ কম। যদি অন্য হিন্দুপ্রধান প্রদেশ থেকে বাংলায় এই সামান্য সংখ্যক লোক ঢুকিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ভারতবিভাগরূপে মহা সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেত। কিন্তু কারোর সঙ্গে পেরে উঠলাম না। আগেই জানতাম এমন হবে। সেজন্য এতকাল সবাইকে কত বলেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। মনে হতো আর কেষ্টদাকে বলতাম, আমার ভাবধারাগুলো নিয়ে বই লিখুন, যদি কারো মাথায় ঢোকে তাহলে কাজ হবে।

যাইহোক শ্রীঠাকুর বৈদ্যনাথ ধামে এসে ওঠার পর এক বছর উত্তীর্ণ হলো। তখন ১৯৪৭ সাল। দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের অভিশাপের বোঝা মাথায় এসে পড়লো। ব্রিটিশের চক্রান্তে অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক আর্য ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো উদ্বাস্তুর হিড়িক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা দলে দলে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে ঠাকুরের চরণে এসে আশ্রয় চাইল। তারা ঠাকুরকে সংবাদ দিল বিহারের মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িঘর বলপূর্বক দখল করছে এবং সেই সঙ্গে ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাচ্ছে। ঠাকুর তখন নিজেই সবকিছু হারিয়ে বিদেশে প্রবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। সেই

ভীষণ দুর্দিনে সকলের দায়িত্ব নিজের কাঁধের উপর নিয়ে তাদের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থানের জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর বড়াল বাংলার দক্ষিণদিকে আমগাছের তলায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় নতুন ভাড়া নেওয়া রঙ্গন ভিলার মালিক একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর তখন বড়াল-বাংলা ও রঙ্গনভিলা এই দুটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে আত্মীয় পরিজন ও অনুচরবর্গ নিয়ে বসবাস করছিলেন।

ঠাকুর রঙ্গনভিলার মালিক ও তার সঙ্গী ভদ্রলোককে দেখে বললেন কেমন আছেন, কুশল তো?

তখন সেই মালিক ভদ্রলোক বললেন, তাঁর এক আত্মীয়ের টনসিল রোগ হয়েছে। ডাক্তারেরা তাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখানে আসার উপদেশ দিয়েছেন। তাই আমার বাড়িটা ছেড়ে দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাতে এসেছি।

ঠাকুর তখন বললেন, দেখুন দাদা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। এদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব আমার উপর নির্ভর করছে। এখানে এদের অবস্থা এমনই যে এরা যদি ভাতের সঙ্গে একটা লঙ্কা পোড়াও পায় তাহলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পারে। কিন্তু তাও জোটে না। এখন আমার এমনই অবস্থা যে আপনি যদি আমাকে বাড়িভাড়া না দিতেন তাহলে জোর করে তা দখল করে নিতে হতো। ভেবে দেখুন এখন যদি আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হয় তো কী ভীষণ বিপদে আমরা পড়ব। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। আমারও সংসার ছিল, বাড়ি ছিল, আমি কখনো কোনদিনও চিন্তা করিনি আপনাদের কাছে শিয়াল কুকুরের মত আশ্রয়ের প্রার্থনা করতে হবে। আমার এই অপারগতার বিরুদ্ধে যে আপনাদের কাছে নালিশ করতে পারলাম এটাই আমার তৃপ্তি। আবার বলি আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। আপনাকে আমি আশীর্বাদ করছি, আপনি সুদীর্ঘজীবী হন। দীর্ঘকাল সুখে শান্তিতে থাকুন, আপনি ধনী হন, রাজরাজেশ্বর হন, আর আমরা যেন আপনার কাছে আশ্রয় পাই। টাকা নিয়েই হোক আর যাই নিয়ে হোক আপনি আমাদের অসময়ে আশ্রয় দিয়েছেন। আর আপনার প্রয়োজনে আমরা যে আপনার বাড়ি ছেড়ে দিতে পারছি না তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে। আমি আমার নিজের কথা বলছি না, এখানকার প্রত্যেকটি লোক আপনার চেয়ে লাখগুণে বিপন্ন। আমরা ওখান থেকে নিরাশ্রয় ও নিরন্ন হয়ে এসেছি, আপনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন বলেই আছি। এর বেশী আর কি বলতে পারি? তবে দেখুন আমি পার্শ্বস্থ Asiatic House ভাড়া নেবার চেষ্টা করছি, সেটা পেলেই আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব, তবে কবে ছেড়ে দিতে

পারব তা ঠিক করে বলতে পারব না।

কলকাতায় তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নারকীয় লীলা চলছে। সেই লীলা কাহিনীর মর্মন্তুদ সংবাদ ঠাকুরের বুকে শেলের মতো বিঁধতে থাকে। ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে তাঁর সংবেদনশীল কোমল হৃদয়। যে মানুষের দুঃখে সততই কাঁদতে থাকে। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পরই নোয়াখালিতে আবার শুরু হলো বিধ্বংসী দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই সকল ঘটনার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করে অভিভূত হয়ে উঠলেন ঠাকুর। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি প্রায়ই সৎসঙ্গের কর্মীদের বলতে লাগলেন তোমরা যদি আরও একটু গতিতে চলতে পারতে তাহলে বাংলার বুকে এই দানবীয় ঘটনা ঘটতে পারত না।

বাস্তুহারাদের লক্ষ্য করে সেকালে ঠাকুর যে একটি বাণী দিয়েছিলেন তা পাঠ করে হয়তো বাংলার সেই সব দুর্গত ব্যক্তিরা এক নতুন মনোবল, ভরসা ও উদ্দীপনা পেয়ে থাকে। বাণীটি হলো এই

বাস্তুহারা হওয়া নিদারুণ—
কিন্তু যোগ্যতাহারা হওয়া সর্বনাশা
এই যোগ্যতাকে
সর্বাঙ্গসুন্দর করে
অর্জন করতে হলেই
আদর্শ কেন্দ্রায়িত হতেই হবে সক্রিয়তায়,
এই সক্রিয় কেন্দ্রায়িত হবার আগ্রহ থেকে
আসে সার্থক বোধোৎপত্তি—
আলিঙ্গনী সংহতি প্রাণতা,
তাই আজ যারা বাস্তুহারা
সর্বনাশের ঘনঘটা যাদের
চারিদিকেই ঘিরে ধরেছে
আগ্রহ আকুল কণ্ঠে তাদের বলি—
সাবধান থেকো
যোগ্যতাকে হারিও না,
এই যোগ্যতা যদি থাকে
লাখ হারানকে অতিক্রম করে
বহু পাওয়ার আবির্ভাব হতে পারে
বিধিমাফিক শ্রম কুশল সৌকর্যে।

যত পার অন্যে নির্ভরশীল হতে যেও না
যা পাও সেইটাকে ধরে
দাঁড়াতে চেষ্টা কর
চলতে চেষ্টা কর
করতে চেষ্টা কর
উপচয়ী পদক্ষেপে
সদনুবর্তিতায় নিছক হয়ে,
যদি চল এমনি করে
সেদিন বেশী দূরে নাই—
অনতিবিলম্বেই আবার পেতে পারবে সবই
আদর্শে কেন্দ্রায়িত হয়ে
চলতে শুরু কর এখনই
যেমন পার তেমনি করেই
চলাটাকে বাড়িয়ে ক্রমশঃই,
প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে
তোমরা সার্থক হও সুস্থ হও
সুখে দীর্ঘজীবী হয়ে
একটা বীর্য্যবান সহযোগী সংহতি নিয়ে
বাস্তব সক্রিয়তায়
প্রতি-প্রত্যেককে উপযুক্ত করে তুলে
যোগ্যতার পথে অটুটভাবে চলন্ত হয়ে চল—
তিনি তোমাদের অন্তরে
অমৃতবর্ষণ করুন।

তখন ঠাকুরের একমাত্র চিন্তা হলো, কী ভাবে তিনি এই আর্ত উদ্বাস্তুদের রক্ষা করবেন, কী ভাবেই বা সাম্প্রদায়িকতার বিষ উচ্ছেদ করবেন মানুষের মন থেকে। এই মহা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন ঠাকুর। বিহারের বুকে পরম মঙ্গলময় দেবাদিদেব মহাদেবের পুণ্য তীর্থে সর্বভারতীয় এক বিপুল কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। তাতে জাতি ধর্ম ও প্রদেশ নির্বিশেষে সারা ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করলেন। তখন ১৯৪৭ সাল। এই উপলক্ষে এক সপ্তাহ ধরে চলতে লাগল সভা সমিতি ও আলাপ আলোচনার অনুষ্ঠান। তাতে বিভিন্ন

প্রদেশের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে লাগলেন।

কিন্তু এই মহান কর্মযজ্ঞকে পণ্ড করে দেবার জন্য শয়তানরা উঠে পড়ে লাগল। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় দুষ্ট প্রকৃতির একদল লোক হঠাৎ 'বড়ালবাংলা' আক্রমণ করল। গুণ্ডাদের এই আকস্মিক আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন আশ্রমবাসীরা। কিন্তু ঠাকুর একেবারে নির্বিকার। কারণ তিনি জানেন পরম পিতা অচিরেই এর একটা ব্যবস্থা করবেন। চারদিক থেকে ঠাকুরের অনুরাগী বহু লোক ছুটে এল ঘটনাস্থলে। অসংখ্য লোকের চাপে পড়ে গুণ্ডারা ভয়ে পালিয়ে গেল, তাদের মধ্যে দু-চারজন কর্মীদের হাতে ধরা পড়ল। কিন্তু পরমদয়াল শ্রী ঠাকুরের নির্দেশে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

অবশেষে গোলমাল থেমে যাওয়ায় সভার কাজ আবার শুরু হলো। ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল। সংবাদ পাওয়া মাত্র একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার পথে রোহিনী রোডের উপর রেল গুমটির পাশে সৎসঙ্গ আশ্রমের একটি সুসজ্জিত তোরণে আগুন দেখতে পেল। পুলিশ তখন চারপাশ অনুসন্ধান করে কয়েকজন গুণ্ডাকে ধরে ফেলল। তাদের থানায় পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও সভানুষ্ঠান পরিদর্শন করে থানায় ফিরে গেলেন।

এরপর সৎসঙ্গ আশ্রমের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা মামলা মকদ্দমা শুরু করে দিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বাদীপক্ষ মামলার অবস্থা খারাপ দেখে আপসে নিষ্পত্তি করার জন্য আশ্রমবাসীদের শরণাপন্ন হলো। তখন ঠাকুর নির্দেশ দিলেন আপসে মীমাংসা হতে পারে তবে আপসের শর্ত কোন পক্ষের কাছে যেন অপমানকর না হয়। এবং কোন পক্ষ যাতে বিপন্ন না হয়।

এইভাবে পরমপিতার ইচ্ছায় সবকিছু শান্তিতে মিটে গেল।

দেওঘরে 'বড়াল বাংলা'কে কেন্দ্র করে সৎসঙ্গ আশ্রমটি ক্রমশই বেড়ে উঠতে থাকে। আশ্রম ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একটি নগরের আকার ধারণ করে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে ঐ অঞ্চলে প্রায়ই চুরি ডাকাতি হতো। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠা হবার পর স্থানীয় চোর ডাকাতেরা যখন তখন অবাধে চুরি ডাকাতি করতে না পেরে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়ে। তখন সেই সব দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা থানার পুলিশদের একাংশকে হাত করে আশ্রমবাসীদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। তারা পুলিশকে বলতে থাকে আশ্রমবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি ডাকাতির কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে।

একদিন বেলা দশটার সময় দেওঘরে এক বড় রকমের ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়। ডাকাতরা ব্যাঙ্ক কর্মীদের বেঁধে রেখে লক্ষাধিক টাকা লুঠ করে একটি ট্যাক্সি করে পালিয়ে যায় কিন্তু থানার কাছে গিয়ে ট্যাক্সিটি হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। এতে বিপন্ন হয়ে ডাকাতরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে ছুটে যায়। একটি দল একটি টাঙ্গা ভাড়া করে লুঠের টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ রোহিনী রোড ধরে আশ্রম পল্লীর দিকে যেতে লাগল। তখন জনগণ তাদের পিছু ধাওয়া করায় তারা রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় দলের দুজন ধরা পড়ে যায়। অন্য দুজন আশ্রমপল্লীর মধ্যে ঢুকে পড়ে একজন আশ্রমকর্মীর ঘরের ভিতর আশ্রয় নেয়। এমন সময় পিছনে ধাবমান পুলিশ এসে সেই ডাকাত দুজনকে ধরে ফেলে এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্তা আশ্রম কর্মী ও কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় নানা লোকে আশ্রমবাসীদের সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। অনেকে বলতে থাকে আশ্রমবাসীরা চুরি ডাকাতি না করলেও চোর ডাকাতদের প্রশ্রয় দেয়। এর ফলে নিরীহ নির্দোষ আশ্রমবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরমপিতার ইচ্ছায় কিছুদিনের মধ্যেই ধৃত আশ্রমবাসীরা আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হন। এবং পরে আশ্রমবাসীরা সমস্ত আশঙ্কা ও সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হন।

কিন্তু পরাজিত পুলিশ পক্ষ এবং তাদের প্রধান ডি.এস.পি আশ্রমের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা নানাভাবে আশ্রমবাসীদের লাঞ্ছনা ও হেনস্থা করার জন্য চক্রান্ত করতে থাকে। এই সব বিরোধী পুলিশ পক্ষের লোকেরা একদিন একটি কুমারী বালিকাকে নিয়ে এক মিথ্যা মামলা সাজিয়ে এক সঙ্ঘ ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যেতে থাকে। যাওয়ার পথে পুলিশ ও তাদের দুষ্ট প্রকৃতির অনুচরেরা সেই ধৃত সঙ্ঘ ভ্রাতাকে মারধোর করতে থাকে। ঘটনাক্রমে তখন সেই পথ দিয়ে ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সঙ্ঘ ভ্রাতাকে পথের মধ্যে ঐ ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে পুলিশকে বলেন, ধৃত ব্যক্তিকে এইভাবে মারধোর করা বেআইনি। শাস্তি যা হবার আদালতের বিচারে হবে। পথেঘাটে এই সব না করে আপনারা ওকে সরাসরি থানায় নিয়ে যান।

এই বলে ভ্রাতাদ্বয় চলে গেলেন। সেই দিন বিকালেই থানা থেকে একজন পুলিশ এসে ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জানায় ডি.এস.পি সাহেব তাদের দুই ভাইকে ডাকছেন।

এই কথা শুনে তারা দুই ভাই থানায় গিয়ে ডি.এস.পি-র সঙ্গে দেখা করতেই ডি এস পি সাহেব বললেন আপনারা পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছেন এটা বেআইনি তাই আপনাদের গ্রেপ্তার করা হলো। এই বলে তাদের দুজনকে পুলিশ হাজতে পাঠিয়ে

দেওয়া হলো। এই খবর শুনে আশ্রমমধ্যে ঠাকুর ও আশ্রমকর্মীরা মর্মাহত হলেন। অনেক চেষ্টা করেও জামিনে মুক্তি পাওয়া গেল না। অবশেষে এক সপ্তাহ পর জেলা জজের কাছ থেকে জামিনে মুক্তির আদেশ এলো। কিন্তু টাকার অঙ্ক অনেক বেশী এবং সেই সঙ্গে আদেশ দেওয়া হয় আসামী দুজন দুমকা শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না।

এই সময় ঠাকুর তাঁর পার্ষদগণ ও দুই পুত্রসহ দুমকায় গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ঠাকুর দুমকায় শুভাগমন করেছেন শুনে সারা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জজ ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য তাঁর বাসস্থানে এসে ভিড় করতে লাগলেন। তার উপর ছিল সাধারণ মানুষের সমাগম।

শহরের প্রান্তে একটি ছোট বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গায় ঠাকুরের বাসের জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। পাশের একটি বাড়িতে ঠাকুরের ভক্ত ও পার্ষদগণের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। অদূরে ছিল নয়নানন্দকর পাহাড় শ্রেণী আর ফসল ভরা উন্মুক্ত মাঠ। এর জন্য জায়গাটি ছিল খুবই মনোরম।

বাড়িটিতে সারাদিন ধরে অধিক রাত পর্যন্ত এত বেশি লোকসমাগম হত যে ঠাকুর বিশ্রামের বিশেষ অবসর পেতেন না। সবসময়ই একদল করে দর্শনার্থী এসে ঠাকুরকে দর্শন করে তাঁর মুখের বাণী শুনতে চাইত। ঠাকুরের মুখনিঃসৃত যে কোন বাণী তাদের কাছে অমৃতের মত মনে হতো। তা শুনে তারা সকলে অতিশয় তৃপ্তি পেতো। দর্শনার্থীরা ঠাকুরকে দর্শন করে ও তাঁর কথা শুনে এমন এক পরমানন্দ লাভ করত যা তাদের সংসারের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিত। যে সব সাধারণ সংসারী মানুষ সবসময়ই অর্থের পিছনে ছুটে চলে স্বার্থপূরণের চেষ্টায় সদাই ব্যস্ত থাকেন সেই সব মানুষ ঠাকুরের কাছে এসে বুঝতে পারে জীবনে অর্থের প্রয়োজন থাকলেও তা কিন্তু সব নয়। পরমার্থ বলে একটা জিনিস আছে আর শ্রীঠাকুর হলেন সেই পরমার্থেরই মূর্ত প্রতীক। ঠাকুরের এ এক লোকাতীত আশ্চর্য মহিমা।

সেকালে বাংলার অমৃতবাজার পত্রিকা, পাটনার 'Search light' ও 'Indian Nation' পত্রিকায় ঠাকুর ও সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জনসেবামূলক কাজকর্মের বিষয়ে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা লিখিত। সেই সব প্রবন্ধ পাঠ করে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন তাই তাঁরা ঠাকুরের দর্শন লাভ করে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে দেওঘরে আসতে থাকেন। তাঁরা ঠাকুরের বাণী শুনে ও জ্ঞানগর্ভ

উপদেশ লাভ করে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন ঠাকুরের কাছে। এ ভাবে ঠাকুর যেখানেই যান সেখানেই তাঁর ভক্ত ও শিষ্যের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়।

এইভাবে দুমকায় সেই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে এক বিরাট আনন্দমেলা গড়ে উঠল।

আশ্চর্যের কথা এই যে ঠাকুর দুমকায় যতদিন অবস্থান করেছিলেন তার মধ্যে এক দিনের জন্যেও দুমকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তাঁর পুত্রদের প্রতি জারি করা সরকারী নিষেধাজ্ঞার কথা ঘুণাক্ষরেও বলেননি। কখনও তিনি দর্শনার্থী বা শরণার্থীদের কাছে ব্যক্তিগত কথা বলতেন না। তাঁর কোন সমস্যার কথা নিয়ে একমাত্র বাড়ির পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়স্বজন ছাড়া কোথাও আলোচনা করতেন না। এটা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি চাইতেন অসংখ্য মানুষের জীবনে নানা সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিতেন। অসংখ্য মানুষের তাপিত প্রাণকে তাঁর উপদেশামৃত সিঞ্চন করে কিছুটা শান্তি দিতে।

এমনকি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পদস্থ অফিসারেরা তাঁর কাছে এলেও তিনি ছেলেদের মামলা ও তাদের উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞার কথা একবারও উত্থাপন করতেন না। এমনই ছিল তাঁর অসাধারণ ধৈর্য ও সংযম। পরমপিতার কাছে এক নিবিড়তম আত্মসমর্পণের ফলেই ঠাকুর যে বিপুল আত্মশক্তি ও আত্মসংযম লাভ করেছিলেন তার জন্যই তিনি সুখে দুঃখে যে কোন অবস্থায় এমন অবিচলিত চিত্ত থাকতে পারতেন। তাঁর যা কিছু ব্যক্তিগত বা আত্মগত কথা তা শুধু তিনি তাঁর পরমপিতাকে জানিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতেন।

এদিকে ধর্মপিপাসু মুমুক্ষু ব্যক্তিরা প্রতিদিনই দলে দলে এসে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে দেওঘরের মত দুমকাতেও ঠাকুরের ভক্ত অনুরাগীদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে।

এদিকে দেওঘরে তখন দুর্গাপূজার সময় প্রতিবারই ঠাকুরের জন্মোৎসব ও কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেই অনুষ্ঠান আরও বড় আকারে করার আয়োজন চলতে লাগল। সম্মেলনের দিন আগতপ্রায়। কিন্তু ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে এই উৎসবের অনুষ্ঠান কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। অথচ এখন দুমকা থেকে ঠাকুরের দেওঘরে ফেরার কোন ইচ্ছা নেই। এ কারণে দেওঘর ও দুমকার বিশিষ্ট ভক্তগণ বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা ঠাকুরকে দেওঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ঠাকুরের এক কথা, তাঁর পুত্রদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে তিনি দেওঘরে প্রত্যাবর্তন করবেন না। তথাপি ভক্ত অনুরাগীগণ তাঁদের চেষ্টা থেকে বিরত হলেন না। অবশেষে ১৯৫২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর দেওঘর কলেজের সেক্রেটারী উমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় বিহার প্রদেশের

প্রাক্তন মন্ত্রী বিনোদানন্দ ঝা, মহেশ্বর প্রসাদ, উকিল তারাচরণ বসু, পাণ্ডা সমাজের নেতৃস্থানীয় ডাকুবাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ঐ দিন বেলা দশটায় দুমকায় গিয়ে ঠাকুরকে সম্মিলিতভাবে দেওঘরে ফিরে আসার বিশেষ অনুরোধ জানান। এই সব মাননীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে ঠাকুর ঐ দিনই বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তাঁদের সকলের সঙ্গে দেওঘরে এসে পৌছান।

ঠাকুরের দেওঘর আগমনের সংবাদ দেওঘর শহরে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে এসে পৌছায়। সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে এক আনন্দময় চাঞ্চল্যের তুমুল সাড়া পড়ে যায়। রোহিনী রোড থেকে 'বড়াল বাংলা' পর্যন্ত সমস্ত পথের দুধারে অসংখ্য নরনারীর এক বিশাল জনতা সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। ঠাকুরের গাড়ি রোহিনী রোডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু 'বন্দে পুরষোত্তম' এই ধ্বনি উত্থিত হয়। এক বিরাট আনন্দ কোলাহলে ফেটে পড়ে সমস্ত মানুষ। সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করতে করতে ঠাকুর বড়াল বাংলায় এসে সঙ্গী ভদ্রলোকদের নিয়ে প্রবেশ করেন।

অনেকদিন পর ঠাকুরের দর্শন লাভ করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে পড়ে জনগণ। কিন্তু সেই বিরাট জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন পুলিশি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়নি। আশ্রমের কর্মীগণের চেষ্টায় সে জনতা বরাবরই সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ ছিল। তা দেখে শ্রীঠাকুরের সঙ্গী বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ সৎসঙ্গ আশ্রমের কর্মীগণের শৃঙ্খলা বোধ ও নিয়মানুবর্তিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অবশেষে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দেওঘরে। সমগ্র বিহার এবং ভারতের সর্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হয়। নানাস্থান থেকে আগত বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

১২ই অক্টোবর পর্যন্ত ঠাকুর দেওঘরেই ছিলেন। ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যার সময় দুমকা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দেওঘরে এসে ঠাকুরকে দুমকা যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে দুমকা বারের প্রসিদ্ধ উকিল, সুরেশবাবু, মহেশ্বরবাবু, বিন্ধ্যেশরীবাবু, মোক্তার তারাবাবু, পি.টি.আই. ও ইউ.পি. আই. এর রিপোর্টার জে.পি.সিংহ ডাক্তার অশোকবাবু প্রভৃতি শহরের গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ ছিলেন। ঠাকুর স্বভাবতই মানী ব্যক্তিদের মান রক্ষা করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই দুমকায় বসবাসের অসুবিধার কথা জেনেও তিনি ঐ সব গন্যমাণ্য ব্যক্তিদের অনুরোধ রক্ষা না করে পারলেন না। তাই আবার দুমকা যেতে সম্মত হলেন। এবার দুমকায় গিয়ে দুই মাস অবস্থান করেন ঠাকুর।

দুমকা শহরের লোকেরা ঠাকুরকে তাদের মধ্যে পুনরায় পেয়ে এক মহানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অসংখ্য নরনারী আবার এসে ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য ভিড় করতে লাগল তাঁর বাসস্থানে। বাঁচা ও বাড়ার অমূল্য উপদেশ পেয়ে এক পরম উৎসাহ লাভ করল তারা তাদের জীবনে। সংসার তাপে ক্লিষ্ট মানুষদের শুষ্ক অন্তরে নূতন করে এক বাঁচার আনন্দের প্লাবন দেখা দিল।

ঠাকুরের পুত্রদের মামলা কিছুটা শিথিল হলেও তখনও চলছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যে তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারও যথেচ্ছ গমনাগমনের আদেশ পৌঁছে গেল। এইভাবে দুমকায় ঠাকুরের অবস্থানের দুইমাস অতিবাহিত হলো।

এদিকে দেওঘরে ডিসেম্বরের কর্মী সম্মেলনের দিন ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে এই উপলক্ষে ঠাকুর ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫২ সাল) সন্ধ্যায় একখানি মোটর যোগে পরিবারবর্গ ও পার্ষদগণ সহ দুমকা থেকে দেওঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। এবারও ঠাকুরের প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে দেওঘরের অসংখ্য নরনারী এক বিরাট জনতা রোহিনী রোডের দুপাশে শৃঙ্খলা ও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শ্রীঠাকুরের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। জনতা বহুক্ষণ আগে থেকেই অক্লান্তভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে বড়ালবাংলার বাড়িটিকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। অবশেষে সন্ধ্যা ছটার সময় জনতার তুমুল হর্ষধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে ঠাকুর বড়াল বাংলায় এসে প্রবেশ করে।

দেওঘরের মানুষেরা দীর্ঘ দুইমাস পর ঠাকুরকে তাদের মধ্যে পেয়ে এক অপার আনন্দ অনুভব করল। কারণ তারা বুঝেছে ঠাকুর শুধু তাদের জীবনের অবলম্বন নন, তাদের হৃদয়েরও একমাত্র আশ্রয়স্থল।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে আবার এক কর্মীসম্মেলন মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। এই উপলক্ষে রেলকর্তৃপক্ষ ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে সৎসঙ্গের কর্মীদের আসার সুবিধার জন্য ১০খানি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন। বৈদ্যনাথ ধাম থেকে দেওঘরের বড়াল বাংলার আশ্রম পর্যন্ত সমগ্র পথটিতে অবিরাম ধারায় জনস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। সমগ্র শহর জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। অসংখ্য মানুষ গাছের তলায় উন্মুক্ত প্রান্তরে যে যেখানে পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে। বাসস্থানের অভাব, জলকষ্ট এবং একসঙ্গে এত অসংখ্য লোকের আহারাদির অসুবিধা সত্ত্বেও কারো মনে কোন ক্ষোভ বা অসন্তোষ নেই। সকল লোকেরই মনের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল এক অনাবিল আনন্দ।

ঐ বছরের অক্টোবর মাসে দুর্গা পূজার সময় ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে আবার এক মহা উৎসব শুরু হয় অন্য বারের মতন। এই উৎসব উপলক্ষেও দেশের নানা

স্থান থেকে বহু লোকসমাগম হয়। এবারেও রেল কর্তৃপক্ষ ১৪খানি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ, বিহার সরকারের মন্ত্রীবর্গ ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই উৎসবে যোগদান করেন। সরকারের সহযোগিতায় আকাশবাণী থেকে এই উৎসবের ধারাবিবরণী প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব চলাকালে বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করে নানা স্থানে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

এইভাবে ঠাকুরের দেওঘর আসার পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ত্রিশটি কর্মী সম্মেলন ও কয়েকটি জন্মোৎসব বিশেষ জাঁকজমক সহকারে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এইসব উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঠাকুরের ভাবধারা ও তাঁর আরব্ধ বিরাট কর্মযজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এদিকে আশ্রমের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মামলা মকদ্দমাগুলিও একে একে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এই সব মামলার কথা জনগণ একেবারেই ভুলে গেল। মহামান্য বিচারপতি উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণের পর মামলাগুলিকে ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যা সাব্যস্ত করে রায় দিলেন।

এদিকে সারা বৈদ্যনাথ ধাম ও বিহার প্রদেশের নানা স্থানে ঠাকুরের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে ঠাকুরের ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা এমন ভাবে বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে যে আর কেউ কোনভাবে সৎসঙ্গ আশ্রমের বিরোধিতা করার সাহস পেল না। এই ভাবে শ্রীঠাকুর বাংলা থেকে সুদূর বিহারে গিয়ে তার কর্মভূমিকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই সঙ্গে জনকল্যাণমূলক এক বিরাট কর্মধারা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ঠাকুর পাবনায় থাকাকালে একটি নগণ্য পল্লীর মধ্যে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন তা সব ফেলে তাঁকে রিক্ত হস্তে শুধু কর্মীগণকে নিয়ে বৈদ্যনাথ ধামে চলে আসতে হয় তাঁকে। হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে তাঁর স্থাপিত বিদ্যালয় বিশ্ববিজ্ঞানাগার, নানা কলকারখানা, প্রভৃতির সব কাজ তিনি সেখান থেকে আসার পর বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁর আশ্রমের সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করায় দুর্বৃত্তদের দ্বারা সেগুলি বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ এই বিপুল বাধা সত্ত্বেও ঠাকুরের কর্মোদ্যম নিঃশেষিত হল না। পরম পিতার আশীর্বাদে তাঁর দিব্য মহাজীবন আবার নূতন করে সৃষ্টিধর্মী কর্মের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে উঠল। শ্রীঠাকুর দেওঘরেও নূতন করে এক কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু করলেন।

সাধনায় ও চরিত্রবলে মানুষকে আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্যে ঠাকুর যতি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। বহুকাল আগে থেকেই ঠাকুর এমন কতকগুলি লোককে

চেয়ে আসছিলেন যারা আহার নিদ্রার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর প্রবর্তিত জনসমাজ ও জাতির সেবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে পাবনায় থাকা কালে শ্রীঠাকুর একদিন বলেছিলেন যদি পাঁচ জন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক পেতাম তাহলে জগৎ কল্যাণের কাজ অনেকটা সহজ হতো। বৈদ্যনাথ ধামে আসার পর ১৯৪৮ সালে মেদিনীপুরে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানের পর থেকেই তিনি এ বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন।

১৩৫৫সনের বিজয়াদশমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর যখন বড়াল বাংলার উত্তরদিকে ত্রিপলে এক দোচালা তাঁবুর ভিতর বসে বিশ্রাম করছিলেন তখন তাঁর কাছে সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র হালদার, কালিদাস মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি সঙ্ঘ ভ্রাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। সহসা ঠাকুর আবেগময় কণ্ঠে তাঁদের বললেন, আগে যেমন পাবনায় ঘরবাড়ি কিছুই ছিল না, কিন্তু একে একে অনেক কিছু হয়ে ওঠে, আবার কি তা করা যায় না?

উপস্থিত সঙ্ঘ ভ্রাতাগণ সর্বান্তঃকরণে ঠাকুরের কথায় সম্মতি জানালেন।

ঠাকুর আরো বললেন, সুরেন থাকলো, শরৎদা থাকলেন, নরেনদা থাকলেন, কালিদাস থাকলো। আমার কাছে কাছেই থাকলেন যখন যেখানে যেতে বললাম গেলেন, যা করতে বললাম করলেন। কি বলেন নরেনদা?

নরেনদা বললেন, আপনি যদি বলেন তাহলে থাকতেই হয়।

ঠাকুর বললেন, আমি কী বলব।

এক্ষেত্রে ঠাকুর কারোর উপর তাঁর নিজের আদেশ চাপিয়ে না দিয়ে কর্মীদের কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা যাচাই করে দেখছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন বললেন, তাহলে থাকলামই, আমরা যে এসেছি সে এসেছি, আর বাড়ি যাব না।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আনন্দে অধীর ও উৎফুল্ল হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, আজ তো ভাল দিন, বিজয়াদশমী, আজ থেকেই এই নবীন জীবনের যাত্রা শুরু হোক।

এই বলে ঠাকুর এদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করে দেবার জন্য তখনই টর্চ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। আশ্রমকর্মী শ্রীসুধীরকুমার দাসকে তখনই ডেকে পাঠান হলো। বড়াল বাংলার উত্তর সীমায় ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন। তখন ঐ জায়গাটি জঙ্গলাকীর্ণ ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিল। আনন্দের আবেগে তিনি তখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই টর্চ হাতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর গৃহ নির্মাণের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে

সুধীরবাবুকে বললেন, এই জায়গাটা যত শীঘ্র পরিষ্কার করে একটা বড় টিনের ঘর তৈরী করে দে আমায়। পরদিন শ্রীঠাকুরের নির্দেশে বড়াল বাংলার আঙ্গিনায় তাদের থাকার ব্যবস্থা ও শ্রীযুক্তা ননীমার তত্ত্বাবধানে বড়াল বাংলার ভিতর তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন পর শৈলেন্দ্রনাথ অসুস্থতাবশত যতি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ননীগোপাল চক্রবর্তী তাঁর স্থান পূরণ করেন।

ইতিমধ্যে যতি জীবন যাত্রা প্রবর্তন প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বললেন, বুড়ো হয়েছি, কবে সরে যাই তার ঠিক নেই। তার জন্যই এই যতি আশ্রম করা। মাটির বুক চিরে না ফেললে যেমন চাষ হয় না, তেমনি মানুষের মন চিরে না ফেললে কাজ হয় না। এতদিন পরে আমার এই বোধ হলো।

এদিকে বড়াল বাংলার উত্তর-পূর্ব কোলে শালকুঞ্জের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠ ও একটি বারান্দাযুক্ত বড় টিনের ঘর, একটি দীক্ষা গৃহ, একটি রন্ধনশালা ও তার সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণ নিয়ে যতি আশ্রম তৈরী হয়। অবশেষে ৯ই মে বুধবার ১৩৫৫সন, ঠাকুর যতি আশ্রমের বাড়িটির দ্বার উদঘাটন করে যতি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিন যতীন্দ্রনাথ দাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঠাকুরের পদতলে যতি জীবনের অধিকার পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে ঠাকুর সানন্দে তাকে অনুমোদন দেন।

সে সময় দিনের বেশিরভাগ সময় ঠাকুর যতিদের আদর্শ জীবন যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন যতি আশ্রমে। সেইসঙ্গে নানা উপদেশ দিতেন তাদের। যতিদের সারা দিনের কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যতিদের জীবনযাত্রা প্রণালী হলো প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ও জাগরণী গান। এই জাগরণী সঙ্গীতে আশ্রমবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। জপধ্যান, সদালোচনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, ইষ্ট প্রাণ জনসেবা, ভিক্ষাদ্বারা উদরান্নের সংস্থান, আহার-বিহারে শুচিতা পালন, পরিবার, পরিজনের সংস্রব পূর্বজন পূর্বক সারাজীবন ইষ্ট নির্দেশে যাপন—যতি গণের অন্যতম প্রধান নিত্য কর্ম। যতিগণের বাসগৃহে অন্য কারোর প্রবেশের অধিকার ছিল না। যতি আশ্রমে স্ত্রীলোকেদের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

আদর্শ যতি জীবন সম্পর্কে ঠাকুর বহু অমূল্য উপদেশ দান করেন, সেই উপদেশগুলি তাঁর মুখ থেকে বাণী রূপে নির্গত হয়। তার বহু বাণীর মধ্যে একটি বাণী সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হলো—

শোন যতি! শোন সন্ন্যাসী, তুমি তারই সন্তান যিনি অনামী পুরুষ, যার কোন নাম ছিল না, তোমারও নাম নেই। বিবর্তনের বহু ঘূর্ণি অতিক্রম করে সংযোগ বিয়োগের

স্রোতে ভেসে আজ তুমি এই অবস্থায় এসেছ। তোমরা কেউ নেই, কেউ ছিলে না, দেখছ যা আছে তা কিন্তু নেই বলে জেনে রেখো। বিশ্বেশ্বর যিনি—তাঁর আশীর্বাদেই তুমি—আর তিনিই তোমার মূর্ত প্রতীক— তোমার ইষ্ট। মনে রেখ, তোমার গৃহের ছাদ আকাশ এবং তোমার শয্যা এই শ্যামলী মায়ের বুকের উপর বিছিয়ে থাকা তৃণবিতান। মনে রেখো, ক্ষুধায় অন্ন পাবে না, তৃষ্ণায় জল পাবে না, অর্থ পাবে না, রোগে শুশ্রূষা পাবে না, তোমার আত্মীয়স্বজন যারা তোমার উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে তারা হয়ত তোমার সম্মুখে দুর্দশার পরিপেষণে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, অপমান করবে, বিচারে উপস্থাপিত করবে—তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে, অচল থাকতে হবে।

এইভাবে ঠাকুর তার বাণীরূপ অমৃত সিঞ্চন দ্বারা সংযমব্রতী যতি সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে আত্মিক শক্তি সঞ্চার করেন এবং তাঁদের মনকে উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করেন।

এরপর ঠাকুর পাবনায় প্রতিষ্ঠিত তপোবন বিদ্যালয়ের অনুরূপে একটি আদর্শ বিদ্যালয় দেওঘরে স্থাপন করেন। দিনটি ছিল ১৯৫১ সালের ১৪ই জুলাই। প্রথমে এই বিদ্যালয়টির কাজ রোহিনী রোডস্থিত রামচন্দ্রালয়ে শুরু হয়। পরে ১৯৫৪ সালের ২৭শে নভেম্বর বিদ্যালয়টি ক্যাস্টার টাউনের তটিনী কুটীর নামক প্রকাণ্ড বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। বাড়িখানা বৈদ্যুতিক আলো সংযুক্ত এবং তাতে অনেকগুলি ঘর থাকায় ছাত্রাবাসও একই সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছিল। এখানেও আচারনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে উন্নত প্রণালীতে বিদ্যালয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। পাবনার তপোবন বিদ্যালয়ের মত এখানেও মাত্র তিন বছরের অল্পবয়সী বালকদের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। লেখাপড়া ছাড়াও ছাত্রগণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষকগণের সহায়তায় শাকসব্জি ও তরিতরকারী উৎপাদন করে থাকে। লৌহকর্ম, কাষ্ঠশিল্প, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়েও বালকগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সঙ্ঘের ও পারিপার্শ্বিক ও স্থানীয় জনসাধারণের ছাপার কাজের সুবিধার জন্য ঠাকুর দেওঘরেও একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের ও বাইরের নানা পুস্তক এই ছাপাখানা থেকে সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে মুদ্রিত হতে থাকে। সঙ্ঘের মাসিক পত্রিকা আলোচনা মুখপত্র প্রভৃতি এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে দেশের নানা স্থানে নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকে। বর্তমানে এই প্রেসে দুটি ফ্ল্যাট ও দুটি ট্রেডল যন্ত্র আছে।

পাবনায় সৎসঙ্ঘ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত বহু পুস্তক আনা হয়নি।

এইজন্য সেই সব পুস্তকের অভাবে অনেকে অসুবিধা ভোগ করছিলেন। এই অভাব দূর করার জন্য বিগত কয়েক বছরের চেষ্টায় পাবনায় ফেলে আসা গ্রন্থগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ দেওঘরের প্রেস থেকে দ্রুত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে বহু নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়। এইভাবে দেওঘরে সৎসঙ্ঘ পাবলিশিং হাউসটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কিছু কালের মধ্যে।

পাবনা থেকে আসার সময় সেখানে কেমিক্যাল ওয়ার্কসের যন্ত্রপাতি কিছুই আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠাকুরের অসীম আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় উপযুক্ত জমি, অর্থ, যন্ত্রপাতি ও কর্মী সংগ্রহ করে দেওঘরেও একটি কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করা হয়। পাবনার মত এই কেমিক্যাল ওয়ার্কসেও দেশীয় উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়া থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা রোগের ওষুধ প্রস্তুত করে দেশের নানা স্থানে তা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর ঠাকুর ভারত ভেষজ কুটীর নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ডাঃ হরিপদ সাহার উপর এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রোগের ভেষজ ওষুধ প্রস্তুত করার জন্য ঠাকুর হরিপদবাবুকে এক একটি ফর্মূলা বা সূত্র দান করতেন। হরিপদবাবুও সেই ফর্মূলা অনুযায়ী দেশীয় গাছগাছড়ার উপাদানে সেই ওষুধ তৈরী করতেন। ওষুধ তৈরীর কাজ আরম্ভ হবার আগে একটি ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনা থেকেই এই কাজের শুরু।

শ্রীঠাকুরের কাছে প্রায়ই গ্যাস্ট্রিক রোগের অনেক রোগী আসত। ঠাকুর এই রোগ সম্বন্ধে অনেক ভাবনা চিন্তা করে হরিপদবাবুকে একটা ফর্মূলা দিলেন। সেই ফর্মূলা অনুযায়ী হরিপদবাবু ওষুধ তৈরী করে রোগীকে দিলেন এবং তাতে রোগ সেরে গেল। তখন ঠাকুর এই ওষুধটির নাম দিলেন 'এন্ট্রোটোন'। এরপর পুরাতন আমাশয় রোগের একটি ওষুধ তৈরী হলো যার নাম হলো 'নাটটোন'। তারপর পাগল ও মাথার রোগের জন্য যে ওষুধ তৈরী হলো ঠাকুর তার নাম দিলেন 'নিউরোটোন'। এইভাবে বহু রোগের ওষুধ তৈরী হলো একে একে। তা রোগীদের উপর প্রয়োগ করে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেল।

শ্রীঠাকুরের দেওঘরে আসার পর থেকে গৃহনির্মাণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদির জন্য কাঠের কাজ চলতে থাকে। প্রথমে একটি গাছের তলাতে এই কাজকর্ম চলতো। কিন্তু ক্রমে কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ায় এটি এক বৃহৎ দারুশিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

প্রথমে ঠাকুর যখন পাবনা থেকে দেওঘরে আসেন তখন বড়ালবাংলা নামক ভাড়া বাড়িটিতে বাস করতে থাকেন। তারপর দেশভাগের পর পাবনা থেকে বহু ভক্ত উদ্বাস্তু

হয়ে দেওঘরে এসে ঠাকুরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। তাদের বাসের জন্য প্রচুর ঘরবাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ঠাকুর নিজ ব্যয়ে বড়াল বাংলা কিনে নিয়ে সরসী ভবন সহ এই দুটি বাড়ির সংস্কার সাধন করে আরও ঘর নির্মাণ করলেন তার মধ্যে। এইভাবে দেওঘরের সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পাবনার মতো এক বিরাট গৃহ নির্মাণ বিভাগ স্থাপিত হলো।

পানীয় জলের জন্য 'বড়ালবাংলা' ওয়েস্ট এণ্ড হাউস, আতর্থী ভবন প্রভৃতি বাড়িতে ছিল বৃহৎ ইঁদারা। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এবং বিশেষ উৎসবে অত্যধিক লোক সমাগমের দরুন অনেক সময় সেগুলি একেবারে জলশূন্য হয়ে পড়ত। এই অসুবিধা চিরতরে দূর করার জন্য ঠাকুর আশ্রমবাড়ির কিঞ্চিৎ দূরে অন্তঃপ্রবাসী দারোয়া নদীতে নলকূপ বসিয়ে পাম্পের সাহায্যে জল সরবরাহের সুন্দর ব্যবস্থা করে দেন। এর ফলে আশ্রমবাসীরা ও শহরের অধিবাসীরা সকলেই উপকৃত হয়।

এরপর ঠাকুর আশ্রমস্থ ও নিকটবর্তী গ্রামবাসী রোগীগণের চিকিৎসার সুবিধার জন্য সৎসঙ্গ মেডিকেল এইড, সৎসঙ্গ দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ভারত ভেষজ কুটীর নামে একটি কবিরাজী বিভাগ স্থাপন করেন। এই সব চিকিৎসালয়ে নিত্য বহু রোগীর চিকিৎসা চলতে থাকে। গুরুতর রোগীদের ডিসপেনসারী সংলগ্ন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই অঞ্চলে যখনই কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিত, সৎসঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিবিধানের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করত।

পাবনার মতো দেওঘরেও একটি আনন্দবাজার নামে এক সাধারণ ভোজনাগার স্থাপন করা হয়। ওয়েস্ট এণ্ড হাউসের ভিতর আঙিনায় এটি অবস্থিত। যে সব আশ্রম কর্মীর নিজেদের আহারাদির পৃথক ব্যবস্থা নেই তারা এই আনন্দবাজারে এসে আহারাদি করত। এছাড়া এখানে কতকগুলি গৃহ ছিল যেখানে বহিরাগত দর্শনার্থীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আনন্দবাজারে তরিতরকারীর ব্যবস্থা না থাকলেও আশ্রমকর্মীগণ ও বহিরাগতরা কেবল ভাত ডাল ঠাকুরের মহাপ্রসাদ হিসাবে পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন। ঠাকুর দেওঘরে আসার পর নানাস্থান থেকে চিঠিপত্র ও প্রণামী টাকা বৈদ্যনাথ ধাম ডাকঘরে আসত। ক্রমে সৎসঙ্গ আশ্রম বড় আকার ধারণ করায় ভারতের নানস্থানের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগের কাজ অনেক বেড়ে যায়। তখন আশ্রমের একটি নিজস্ব ডাকবিভাগের অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই মর্মে ঠাকুর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেন। অবশেষে বিহার সরকার ১৯৫১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সৎসঙ্গ নামে একটি পৃথক স্থায়ী ডাকঘর স্থাপনের অনুমতি দেয়।

'ওয়েস্ট এণ্ড হাউসের' একটি প্রশস্ত কক্ষে এই ডাকঘর স্থাপিত হয়। এই ডাকঘরটি স্থাপিত হওয়ায় সঙেঘর এবং নিকটবর্তী অধিবাসীবৃন্দের কাজকর্মের খুব সুবিধা হয়।

পাবনার মত দেওঘরেও একটি ফিলানথ্রপি বিভাগ স্থাপিত হয়। ঠাকুর বিশ্বজোড়া যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করেন তার ধারক ও বাহক হলো এই ফিলানথ্রপি বিভাগ। সরসী ভবনের দ্বিতলটি এই বিভাগ ও এর নানা দপ্তরের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর জন্য সরসী ভবনের দ্বিতলে বহু কক্ষ নির্মিত হয়। ঠাকুরের দেশবিদেশের শিষ্যবর্গ প্রতিমাসে ইষ্টভৃতি নামে যে অর্ঘ্য প্রণামী পাঠিয়ে দেন, সৎসঙ্গের বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানের যে আয় হয় ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা সব এই ফিলানথ্রপি অফিসে জমা হয় এবং এই অফিস মারফত বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত হয়।

ঠাকুরের জন্মতিথি ও জন্মমহোৎসব পালন, নববর্ষ উদ্‌যাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিচালনা সমস্ত ব্যবস্থা এই ফিলানথ্রপি বিভাগের কর্মীরা বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন।

শ্রীঠাকুর যতদিন সশরীরে বর্তমান ছিলেন ততদিন তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ নাম ধ্যানের পর আহারে বসতেন। তাঁর রাত্রি যাপনের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কখনো 'বড়াল বাংলা'র ঘরে, কখনো নিভৃত কেতনে কখনো এর সামনের টিনের ঘরে, কখনো জামতলার ঘরে কখনো বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করতেন। সকাল বিকাল মধ্যাহ্ন ও রাত্রিতে আলাপ-আলোচনার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কখনো উপরিউক্ত আশ্রম গৃহের ভিতর, কখনো যতি আশ্রমের বারান্দায়, কখনো কাঠের কারখানার সামনে, কখনো বা আশ্রমের আঙিনায় ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে আলাপ আলোচনায় বসতেন। বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে এবং নিজের শারীরিক অবস্থানুসারে নানা স্থানে তাঁর বৈঠক বসত। সেই বৈঠকে বহু ভক্ত শিষ্য ও আগন্তুকগণ উপস্থিত থাকতেন। ঠাকুর শান্ত কণ্ঠে সকলের সব প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং বহু সমস্যার সমাধানের উপায় বলে দিতেন। সকলেই তাঁর মধুর বচন ও বাণী শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। বৈঠক বসত সকালে বিকালে দুই বার। সকালের দিকে নামধ্যান ও প্রাতরাশের পর ঠাকুর এসে বসতেই বহু দর্শনার্থীর ভিড় জমে যেত। মধ্যাহ্নভোজনের আগে ঠাকুর উঠে না যাওয়া পর্যন্ত বৈঠক চলত। বিকালে আবার তিনটা নাগাদ বিশ্রামের পর ঠাকুর এসে বৈঠকে মিলিত হতেন। এই বৈঠকের সময় বৈঠকের স্থান তার ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট হতো।

১২

ঠাকুর জাতিস্মরতা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছিলেন —

পাওয়ার যদি কিছু তা,
অমর জাতিস্মর
মরণভেদী জীবন বীর—
সজাগ নিরন্তর।

শ্রীঠাকুর 'চলার সাথী' গ্রন্থে বলেছেন, 'আর গম্য যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে স্মৃতিবাহী চেতনা—যা জীবন ও মরণকে ভেদ করে পরবর্তীতে পৌঁছে দেয়। মানুষের আত্মা অমর মৃত্যুর পর এই আত্মা আবার এক নূতন দেহ ধারণ করে বারবার পৃথিবীতে আসে এবং মানবজগতের জীবনধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলে। কিন্তু মানুষের জন্মান্তরের স্মৃতিবাহী চেতনাটি আচ্ছন্ন থাকে বলে মানুষ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে না।

ঠাকুরের পূর্ব জন্মের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকলেও সহানুভূতিশীল লোকের অভাবে তিনি তা বাইরের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতেন না। কারণ সাধারণ লোক তা বিশ্বাস করবে না।

ভারতের ঋষিরা বলেছেন মানুষ অমৃতের পুত্র, তার আত্মা অমর। প্রত্যেকেই যাতে আত্মচৈতন্য ফিরে পায় এবং ইহজীবনেই যাতে 'অমৃতস্য পুত্রা' এই ঋষি বাক্যের সত্যতা বাস্তব জীবনে অনুভব করে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অধিকারী হতে পারে তার জন্য ঠাকুর কত না আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

মানুষ যাতে জন্মান্তরে স্মৃতিবাহী আত্মচৈতন্যকে করায়ত্ত করতে পারে তার উপায় সম্বন্ধে চেষ্টার অন্ত ছিল না ঠাকুরের। পাবনায় থাকাকালে তিনি মাসে মাসে চিন্তাশীল আশ্রমকর্মী ও বিশিষ্ট সঙ্ঘভ্রাতাদের সঙ্গে জাতিস্মরতা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

আমরা মাঝে মাঝে এক একজন জাতিস্মরের কথা শুনি কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সেই জাতিস্মর প্রদত্ত তথ্যগুলির উদঘাটন হয়নি। ঠাকুরের নির্দেশে একবার সৎ সঙ্ঘের সহ সভাপতি সুশীলচন্দ্র বসু ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতিস্মরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। ঠাকুর তার কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট করে দেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি। একটি বর্তমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতিস্মরের সন্ধান ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তাঁদের জীবনের তথ্য উদঘাটন। অপরটি ভৃগুসংহিতার অনুসন্ধান ও বাস্তব ভৃগুসংহিতার সম্পূর্ণ হস্তলিপির নকল উদ্ধার। এ নিয়ে আগে থেকে বহু জ্যোতিষ ঠাকুরের কাছে আলোচনা করতে আসতেন।

সুশীলচন্দ্র বসু ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কাশ্মীরের রাজপুস্তকাগারে মূল ভৃগুসংহিতার সন্ধান পান। সেখানে বহু টাকা ব্যয় করে তিনি মূল গ্রন্থটির একটি নকল তৈরী করেন এবং পাবনায় নিয়ে আসেন। এছাড়া শান্তিদেবী ও আরও কয়েকজন জাতিস্মরের সন্ধান পান। পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি তাদের সাক্ষাতাদি গ্রহণ করেন। পরে তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন যে জাতিস্মরতা কেবল প্রাচীন যুগের ব্যাপার নয়, বর্তমানেও তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই জাতিস্মরতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একদিকে যেমন আমাদের মনোবিজ্ঞানের স্মৃতি, বিস্মৃতি, একাগ্রতা, প্রেম, আধ্যাত্মিক সাধনার উপর নূতন বৈজ্ঞানিক আলোকপাত ঘটবে, অন্যদিকে বিদেহী আত্মা, অতিবাহিক দেহ, জন্মান্তরের কর্মফল প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে পূর্বজন্ম ও পরজন্ম শুধু কল্পনার কথা নয়, এও এক বাস্তব সত্য। তবে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এদিকে এখনো পড়েনি।

তবে একবারেই যে নেই তা নয়। মরিস মেটারলিঙ্কের একখানি বই আছে 'Our Immortality', তাতে দেখা যায় ফরাসী দেশে সংমোহনবিদ্যা (Hypnotism) প্রয়োগ করে একটি নারী পশ্চাদপ্রসারী স্মৃতির সাহায্যে পূর্ব কয়েকজন্মের বিবরণ দান করেছেন।

পরম প্রেমময় শ্রীঠাকুর একবার বলেছিলেন, পশ্চাদপ্রসারী স্মৃতির সাহায্যে তিনি মাঝে মাঝে অতি শৈশবে গিয়ে উপনীত হতেন। আরও পশ্চাতে যেতে গিয়ে দেখতেন সব অন্ধকার হয়ে যায়। আরও পশ্চাতে গিয়ে তিনি দেখেন, তিনি অতিবৃদ্ধ অবস্থায় গলায় ক্ষত নিয়ে শুয়ে আছেন আর বহুলোক তাঁর চারদিকে ঘিরে আছে। শ্রীঠাকুরের ভৃগুসংহিতার যে সংস্কৃত কোষ্ঠী বেনারসীর ভৃগু কার্যালয় থেকে নকল করে পাঠান হয়েছে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের এই অনুভূতির সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়।

বর্তমানে আমেরিকার জাতিস্মরতা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে যার নাম ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে অধ্যাপক মেক ডুগালের পরিচালনায় এই ধরনের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ডক্টর রাইন প্রমুখ বিশিষ্ট গবেষকগণ এই বিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে রত আছেন।

শান্তিদেবী তাঁর 'জাতিস্মরের আত্মকথায়'এই প্রমাণ বৈজ্ঞানিকভাবে, বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে দান করছেন। তাই তাঁর অনুভূতিগুলো বিশিষ্টতা লাভ করেছে। শান্তি দেবী দিল্লী থেকে দেওঘরে এসে শ্রীঠাকুর ও বিশিষ্ট সঙ্ঘভ্রাতাদের উপস্থিতিতে তাঁর আত্মকথা ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, আমার জন্ম হয় পুরান দিল্লীর মাড়োয়ারী কাটরার কাপড়ের বাজারের

কাছে। আমার বয়স বাইশ বছর দশ মাস। তিন বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম বোবা। বাবা ডাক্তারদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা বলতেন, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার বেশ মনে পড়ে আমার ঘরে একটি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ছিল। জন্ম থেকে তিন বছর পর্যন্ত আমি সেই মূর্তিটিকে রোজ পূজো করতাম। তারপর একদিন মূর্তিটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি তখন মনে একটা ঘা খেলাম। তারপর কেন জানি না হঠাৎ মার কাছে আমি পূর্বজন্মের কথা বলতে লাগলাম। সেই প্রথম আমার কথা বলার সূত্রপাত। তিন বছর পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ বোবা ছিলাম। আমি বোবা থাকলেও পূর্বজন্মের কথা আমার মনে পড়ত। আমি যে অতি ছোট তা মোটেই মনে হতো না। মনে হতো আমি বেশ বড় এবং এই মা আমার মা নয়। আমার আগের জন্মের মায়ের স্মৃতি এখনও আমার মনে বেশ জাগ্রত আছে। মনের ভিতর সর্বদা ঘুরত আমার পূর্বজন্মের মৃত্যুসময়ের ছবি, তখনকার সব ঘটনা। মনে পড়ত আমি হাসপাতালে শুয়ে আছি। আমার চারপাশে চারজন লোক দাঁড়িয়ে। তারা সকলে কী একটা পাত্র ধরেছিল। পাত্রটি মনে হত কাঠের তৈরী। খানিকটা আলোর ধুঁয়োর মতো কী একটা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ পাত্রের মধ্যে ঢুকে গেল। আর সেই চারজন লোক ধোঁয়াটা ঐ পাত্রের মধ্যেও ধরে আকাশের উপর থেকে আরো উপরে উঠতে লাগল। দেহটা আমার ছেড়ে এলাম, কিন্তু আমি যে ঐ পাত্রের মধ্যেই আছি এ বোধ ছিল টনটনে।

শান্তিদেবীকে প্রশ্ন করা হল মৃত্যুর সময় আপনার চেতনা ছিল কিনা, মনে পড়ে কি?

উত্তরে তিনি বললেন, চেতনা আমার সর্বক্ষণই ছিল, গুরুদেবে মূর্তি ধ্যান করছিলাম।

পরের প্রশ্ন : আপনার মৃত্যু কি স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল?

উত্তর : পনেরো দিন আগে পরে আমার দুইটি অপারেশন হয়, একটি পায়ে অপরটি জরায়ুতে। সেবার আমি হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। সেখানে শিবজীর মন্দির একশত আটবার প্রদক্ষিণ করার সময় একটি হাড়ের টুকরো আমার পায়ের তলায় ঢুকে যায়। ফলে সেফটিক হয়ে যায়। আমি তখন আসন্নপ্রসবা। সেই অবস্থাতেই আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপারেশন ভালভাবেই হয় এবং ঐ অপারেশনের দিনই আমার একটি ছেলে হয়। প্রসবের সময়ও অপারেশনের প্রয়োজন হয়। ঐ অপারেশনের নয় দিনের দিন আমার মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন : জন্মমুহূর্তের কথা কি আপনার মনে আছে?

উত্তর : আমার যখন জন্ম হয় তখন দিন, শুধু এটুকুই আমার মনে আছে। আমার

বয়স যখন দুই কি আড়াই - আবহাওয়ার পরিবর্তনটা যেন দেখতে লাগলাম আর বোধ আসতে লাগল। এই পরিবেশের তফাত আর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আবার আমার মনে গতজীবন ভেসে উঠল। এর পূর্বে এই আড়াই বছরের পূর্ব পর্যন্ত চেতনা আমার ছিল। ঐ সময়ে প্রায়ই ভগবান শিব বিষ্ণু দেবী এবং বিশেষ করে ভগবান শিবের দর্শন আমি লাভ করেছি। এই সময় থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একখানি ছবি আমি রেখেছিলাম। সেটা আমি আমার নিজের মত করে পুজো করতাম। এরপর ছয়মাস আমি খালি আমার গতজীবন সম্বন্ধে ভাবতাম। তখন আমার বয়স সাড়ে তিন বছর। আমি তখন মাকে প্রায়ই বলতাম, এটা আমার বাড়ি নয়। তুমি আমার মা নও, আমার আগের মা তোমার চেয়ে অনেক ভাল ছিল। আমার স্বামীর বাড়ি ও বাবার বাড়ি মথুরায়—আমার বাবা মা সেখানে আছেন।

আমার বয়স যখন ছয় কি সাড়ে ছয় তখন আমার একবার কঠিন রোগ হয়। জ্বরে তখন প্রায় আমি অজ্ঞান। আমার সম্পর্কের এক দাদু এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি চাও?

তখন আমি বললাম আমি মথুরায় যেতে চাই।

তিনি তখন আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি কিছু ভেবো না, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব।

এরপর আমি পূর্বজন্মের মথুরার বাড়ির ঠিকানা, স্বামীর নাম সব লিখে দিলাম। আমার স্বামীকে খবর দেওয়া হলো তিনি এলেন এবং আমাকে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হল। আমার সঙ্গে চার-পাঁচজন কংগ্রেসের নেতা, খবরের কাগজের সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার ইত্যাদি করে প্রায় ত্রিশজন লোক আমার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিল। স্টেশনে যারা আমাকে নিতে এসেছিল তাদের দেখেই আমার পূর্বজন্মের আত্মীয় বলে চিনিয়ে দিলাম। আমি গাড়োয়ানদের বাড়ির রাস্তা বলে দিলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম আগের চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার অনেক মিল। আমি যে ঘরে টাকা রাখতাম সে ঘরে গিয়ে দেখলাম পাটাতনের তলায় আমি যে টাকা রেখেছিলাম সেটা নেই। আমার স্বামী আমাকে না জানিয়ে আমার সব টাকা নিয়ে নেওয়ায় আমি বেশ ক্ষুব্ধ হলাম।

আমার বাবার বাড়ি ও স্বামীর বাড়ি কাছাকাছি ছিল। আমি সেখানে গিয়ে কাকিমাকে প্রথমে চিনতে পারি। তারপর মায়ের কোলে গিয়ে বসে পড়ি। এরপর আমার ভাই, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের চিনতে পারি। আবার তারাও আমার নানা প্রমাণমূলক কথা শুনে আমি যে তাদেরই মেয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

প্রশ্ন ঃ এ জীবনে আপনার ভাই বোন কটি?

উত্তর ঃ আমার একটি ছোট ভাই আছে, সে বি.এ. পড়ে। আর দুটি বড় বোন আছেন। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁরা দিল্লীতে স্বামীর কাছে আছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার এই যে জাতিস্মরত্ব এর কোন বিকাশ আপনার ভাই বোনেদের ভিতর দেখা যায় কি?

উত্তর ঃ না, আধ্যাত্মিকতার চাইতে পার্থিব জগতের প্রতিষ্ঠান তাদের অনেক বেশী। আমার মা'ও ভগবান ভালবাসেন। ভক্তিভরে পূজা আর্চাও করেন, দীক্ষাও গ্রহণ করেছেন কিন্তু সাংসারিক গল্পগুজব তিনি খুব ভালবাসেন। আর যারা তাঁর প্রতি অনুরক্ত তাদের তিনি বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু পূর্বের মা ছিলেন সৎবিবেচক উদার ও তাঁর মনটা ছিল বড় পবিত্র।

প্রশ্ন ঃ মথুরার ভাষা কি আপনার মনে আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আগের জীবনের ভাষা আমার মনে আছে। এ জীবনে এটা আবার নতুন করে শিখতে হয়নি। হিন্দির অক্ষর পরিচয়ের আমার প্রয়োজন হয়নি। গত জীবনে আমি বলতাম ব্রজবুলি—হিন্দি আর সংস্কৃতও আমি জানতাম। ইংরাজী বাদে এ সবগুলি আমি নিজেই পড়তে পেরেছি। আজকাল আবার বাংলাও আমি কিছু শিখছি।

প্রশ্ন ঃ গতজীবনে আপনি কি স্কুলে পড়তেন?

উত্তর ঃ আমি বাড়িতেই পড়তাম। কেননা স্কুলে যাওয়াটা ওরা পছন্দ করত না।

প্রশ্ন ঃ আপনার পূর্বজন্মে তার আগের জন্মের কথা স্মরণ ছিল কি?

উত্তর ঃ না আগের জন্মে জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। তবে আমি তখন ঋষিদের কথা পড়েছিলাম তাঁরা এই জাতিস্মরত্ব শক্তি লাভ করেছিলেন। তা পড়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তাহলে মানুষের পক্ষে এই শক্তিলাভ সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আপনার নিজ পারিবারিক বিষয় ছাড়া অন্য কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি? কোন অবস্থায় ঐ রকমের কোন ঘটনা আপনার মনে পড়েছে কি?

উত্তর ঃ আমার মনে আছে গত জীবনে আমি ঋষিদের স্বপ্নে দেখতাম তাঁরা আমার ভবিষ্যতে কী ঘটবে এ বিষয়ে প্রায়ই জানাতেন। আর তা পরে মিলেও যেত।

প্রশ্ন ঃ আত্মীয়স্বজনের জন্য শোক দুঃখ আপনার মৃত্যু মুহূর্তে বা তারপরে আপনাকে কোনরকম অভিভূত করেছিল কি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর আগে আপনি যে সন্তান প্রসব করেছিলেন তার জন্যও কি আপনি কোন টান বোধ করেননি বা আর কারুর জন্য কি কোন পিছুটান আপনার ছিল না?

উত্তর ঃ ছেলেটির প্রসবের পর আমি নয়দিন অজ্ঞান ছিলাম। তবে তার জন্মের

পূর্বেই নিজের মৃত্যু বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম।

পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু কথা ও সুদূর শৈশব জীবনের কথার অনেক কিছুই ঠাকুরের স্মৃতিপটে বেশী উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। কিন্তু তা তিনি বাইরে প্রকাশ করতে চাইতেন না। তবে কথাপ্রসঙ্গে কখনো কখনো তিনি কিছু কিছু এই সব কথা বলতেন।

একদিন পাবনায় থাকাকালে শ্রীঠাকুর কুষ্টিয়া নিবাসী গোকুলচন্দ্রকে বললেন, আপনার অতি শৈশবের কথা মনে আছে কি?

গোকুলবাবু বললেন, না, তা কি কারো মনে থাকে।

ঠাকুর বললেন, কেন থাকবে না, একটু চেষ্টা করলেই মানুষ তা মনে করতে পারে। যেমন আমার আছে। আমার জন্মের পর নাড়ি কাটার সময় মা যখন গরম সেঁক দিতেন, তখন আমার ভাল লাগত না, আমি কাঁদতাম, তা কেউ বুঝত না, আমি বলতে পারতাম না, তা আমার বেশ মনে আছে। আমার আরও মনে আছে শৈশবে আমি একটা লাঠি হাতে করে থাকতে বড় ভালবাসতাম। সেইজন্য অনেকে আমায় গাড়োয়ান বলে ডাকত আদর করে।

একদিন গোকুলচন্দ্র ঠাকুরকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্বজন্মের কথা আপনার কিছু মনে আছে? এর আগে একদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন মানুষ চেষ্টা করলেই মনে রাখতে পারে। আপনিও চেষ্টা করে কিছু মনে করে বলুন না।

ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ পারি তবে সে কথা থাক। তখন গোকুলচন্দ্র বারবার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালে আর তিনি এড়িয়ে যেতে পারলেন না। তিনি বললেন ঠিক আছে, তবে কারো কাছে একথা প্রকাশ করবেন না।

গোকুলচন্দ্র বললেন, একেবারে কারো কাছে বলব না তা কি বলতে পারি?

ঠাকুর তখন বললেন, তবে বিশেষ ভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করবেন না বলুন।

তখন গোকুলচন্দ্র বললেন তাই হবে।

শ্রীঠাকুর এবার বলতে লাগলেন, আমার মনে হয় পূর্বজন্মে আমি এক রাজার ঘরে জন্মেছিলাম। বাড়িতে একটা গম্বুজের মত ছিল। তার চূড়া সোনার পাতে মোড়া ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীলোকেরা আমাকে বড়ো ভালবাসতো। বালকেরা কোন মিষ্টি খাবার দ্রব্য পেলে আমাকে না দিয়ে খেতো না। পশুপক্ষীরা পর্যন্ত আমাকে ভালবাসতো। গরু বাছুরগুলিও আমাকে খুব ভালবাসতো।

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন, পূর্বজন্মের আগে এক জন্মে হিমালয় পর্বতের এক গহ্বরে আমি সাধনা করতাম। সেখানে একটা বড় শ্বেতপাথর ছিল ও

একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণের ফুলের বড় একটা লতা গাছ ছিল। আমার মনে হয়, এখনও সে পথ চিনে যেতে পারি।

আর একদিন শ্রীঠাকুর সৎসঙ্গ আশ্রমের পদ্মাতীরস্থ পশ্চিম দিকের একটি বেদীর উপর বসে তত্ত্বালোচনা করছিলেন। অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। সহসা ঠাকুর বলে উঠলেন, একি? এরূপ মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করার মধ্যেও হঠাৎ আমার কেন মনে হচ্ছে যে আমি যেন সরযূ নদীর তীরে বসে আছি, আর এই সেই সরযূ নদী।

আর একদিন পূর্বজন্মের কর্মফল সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় পার্ষদ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারও কি পূর্বজন্মের কর্মফল ছিল? আর তার জন্যেই কী এ জীবনে ভুগতে হচ্ছে?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, আমার এত কর্মফল ছিল, আর তা যদি বলি, আর তা যদি আপনারা শোনেন, তবে আপনারা মূর্ছা যাবেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যত কর্মফল সব আমাকে...

এই বলেই সে কথাটা চাপা দিয়ে তিনি অন্য কথা উত্থাপন করলেন। ভক্তরাও আর সাহস করে এবিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

১৯২৬ সনের ২রা নভেম্বর রাত্রিতে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর জগৎ ও মানবজীবনের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও জীবনের ধারাটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন। একথা সেকথা হতে হতে ঠাকুর হঠাৎ বলে উঠলেন, দেখছি এক অ্যাটম (Atom) সেটা হঠাৎ ভেঙে চৌচির হয়ে সেই অণু থেকে ক্ষুদ্রতর লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন বেরুচ্ছে। যেগুলি আবার আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দরুন (attraction and repulsion) নানারূপ দানা বাঁধছে। আবার সেগুলো যেন আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। একটা আরও ছোট, দানা থেকে যেন একটা সাব ইলেকট্রন, আবার সেই ছোট পয়েন্ট-এর মত দানাটা আবার ঝক করে ফেটে গেল। তার থেকে আরও মিলিয়ন মিলিয়ন ক্ষুদ্র হাইপার ইলেকট্রন সমস্ত ব্যাপ্ত করে ফেলল। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে শেষে একটা দানাতে গিয়ে পৌছে। ঐ থেকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, ঐ দানা থেকে কতকগুলি ক্রমপর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমার অহং-এর দানাটা এক জীবন্ত জীবের মধ্যে এসে পড়ল। দেখলাম যেন জলের ভিতর কুমীর হয়ে আছি, এক জন্মে গাছ হয়ে আছি। তারপর দেখলাম ছোট ছেলে হয়ে দৌড়াচ্চি, শেষে বিয়ে হল, স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করছি। তারপর দেখলাম ধীরে ধীরে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমার দেহটা পড়ে আছে, সবাই কান্নাকাটি করছে। তখন হঠাৎ মনে হলো, সত্যিই কি আমি মরে গেছি? তারপর যেন একটা গ্যাপ বা ফাঁকের মত লাগে। তারপর আবার একটা নতুন জীবন চলতে থাকে।

এমনি এক জীবনে মনে হয় আমি চামার ছিলাম। এক জীবনে রাজার ঘরে জন্মেছিলাম। আর এক জীবনে মনে হয় কোন পাহাড়ের পাদদেশে ঘর বেঁধে আশ্রম করেছি। এমনি করে এই শেষ জীবনে এসে পৌঁছেছি। আর এ জন্মের কথাতো সব মনেই আছে। দেখলাম এক আলোক ধারা হয়ে আমি সূর্যের মধ্যে নেমে এসেছি। সূর্যের ভিতর পৃথিবীর মতো ঠাণ্ডা জায়গা অনুভব করলাম। সেখানে যে সব জীব আছে তাদের ভাব আর পৃথিবীর জীবের ভাব সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের ভাব প্রকাশ করার উপায় এখানে নেই। সূর্যের ভিতর দিয়ে যখন আসছি তখন জ্যোতির সব পাহাড় দেখলাম, আর সেগুলোকে পজিটিভ মনে হলো। কারণ তারা যেন স্বতঃই জ্যোতিঃকণা অনবরত চারদিকে বিকীর্ণ ও বিচ্ছুরিত করছে। তারপর নানাস্তরের মধ্য দিয়ে কত গ্রহ-উপগ্রহের ভিতর দিয়ে চলে এসেছি। আমার আসার সময় সেই সব স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা কত স্তব স্তুতি করছিল। তা শুনে তাদের ফেলে আসতে যেন ইচ্ছা হচ্ছিল না।

তারপর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করলাম। নাম নিয়েই জন্মেছিলাম। নামই আমার জন্মের ভিত্তি। তাই মাতৃগর্ভে থাকতেই আমি নাম করতাম। আমার মনে পড়ে, ভূমিষ্ঠ হয়ে আমি কাঁদিনি। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র হেসে উঠেছিলাম।

১৩৫৭ সনে ২৭শে আশ্বিন ঠাকুর বলছিলেন, পূর্বজন্মের অনেক কথা মনে হয়। মনে হয় একটা অপ্রশস্ত সুগভীর নদী। আর আশেপাশে পাথর আছে। তারই একটির উপর আমি ও আমার বউ বসে। আমার কয়েকজন ভাই কাছাকাছি ছিল। মেলা টগর ফুটে আছে স্থানটিতে। নদীটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে। খানিকটা দূরে বাঁশবন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জল আলো হয়ে উঠছে।

আরও একটা কথা মনে পড়ে। যেন উধাও মাঠ। কুরুক্ষেত্র কিনা জানি না। দূরে অতিদূরে সোনা দিয়ে মোড়া মন্দিরের চূড়া, আর একটা জায়গার কথা মনে পড়ে। অনেকটা আপনাদের মণিপুরের মত জায়গা। সেখানে একটা বাজার বসে। মাটির চালা আছে। কাঠের ঘর, কাঠের পাটাতন। মনে হয় সেখানে একটা বৌ আছে, তাকে দেখলে যেন চিনি। কিভাবে মনে হয় জানি না। কল্পনা কিনা তাও জানি না। কিন্তু একটা স্পষ্ট ছাপ আছে।

১৩

শ্রীঠাকুরের জীবন ধারা সম্যক বোঝা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। তার জীবনের

যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই অপূর্ব ও অপার্থিব বলে মনে হয়। এই মহাজীবন একদিকে যেমন প্রজ্ঞায় সতত ভাস্বর, প্রেমে সমুজ্জ্বল ও কর্মে মহীয়ান তেমনি অন্যদিকে দুর্গম ও গম্ভীর। কতকাল ধরে কত ধরনের লোক কতরকম ভাবে ঠাকুরের সঙ্গে মেলামেশা করেছে এবং তারা তা কতই যে অলৌকিক ও অপার্থিব শক্তির পরিচয় পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঠাকুরের বাস্তব জীবনের বহু ঘটনাই অলৌকিক বলে মনে হয়। কারণ সেই সব ঘটনার মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ পাওয়া যায় না বলে সাধারণের কাছে সেগুলো দুর্বোধ্য।

এ বিষয়ে তাঁর কয়েকজন পার্ষদের কাছ থেকে এই ধরনের কতকগুলি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

পার্ষদ সুশীলচন্দ্র বসু এমনই একটি ঘটনার কথা বলে। সে আজ অনেক দিনের কথা। বেলিয়াঘাটায় হরিহর গাঙ্গুলী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পাবনায় শ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে এলেন। কিছুদিন আশ্রমে থাকার পর হঠাৎ ঠাকুর একদিন তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, দাদা আপনি কি কাজ করেন?

উত্তরে ঐ ভদ্রলোক বললেন যে, তিনি মার্টিন কোম্পানীতে ৫০০ টাকা বেতনে ড্রাফটস্ম্যানের কাজ করেন।

ঠাকুর তখন বললেন, এ কাজ কি পাবনায় পাওয়া যায় না?

হরিহরবাবু বললেন, জেলা বোর্ডে এ কাজের জন্য লোক দরকার হতে পারে।

একথা শুনে ঠাকুর আমাকে ডেকে বললেন, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের সঙ্গে তো আপনার জানাশোনা আছে, দাদাকে নিয়ে একবার তাঁর কাছে যান। যদি এখানকার কাজটা হয়ে যায়।

ঠাকুরের আদেশে আমি হরিহরবাবুকে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাদের কথা বললাম। কথাটা শুনে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বললেন, আমাদের এখানে একটা কাজ আছে বটে, তবে আমরা দেড়শো টাকার বেশি দিতে পারব না। উনি কলকাতায় ৫০০ টাকা বেতনের কাজ ছেড়ে এই জঙ্গলে মরতে আসবেন কেন? তাছাড়া কলকাতায় ওঁর মাইনে আরও বাড়তে পারে।

আমরা ফিরে এসে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কথা ঠাকুরকে জানালাম। তিনি তখন হরিহরবাবুর কাছে জানতে চাইলেন তাঁর পরিবারে পোষ্য কয়জন।

তার উত্তরে হরিহরবাবু বললেন, মোট চারজন। ঠাকুর তখন বললেন, দেড়শো টাকায় এখানে চারজনের বেশ চলে যাবে। আপনি কালই কলকাতায় ফিরে আপনার পরিবারবর্গকে নিয়ে আসুন।

হরিহরবাবু পরের দিন কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন। কলকাতার চাকরি ছেড়ে

পাবনায় চাকরী করতে যাবার কথা শুনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই বলতে লাগল যে হরিহরবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত হরিহরবাবুর আর পাবনায় আসা হয়নি। এই ঘটনার ছয় মাস পর হরিহরবাবুর একদিন কঠিন রোগ হল, Galloping pthisis। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল বাঁচার আশা নেই। তখন হরিহরবাবু নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে ঠাকুরকে একটি চিঠি লেখেন।

উত্তরে ঠাকুর লেখেন, দাদা সময় থাকতে তো আর এলেন না, এখন যখন সব শেষ সবই হাতের বাইরে চলে গেছে তখন আসতে চাইছেন। এখন আর কি করা যায়। যাই হোক এখন পরমপিতাকে মনেপ্রাণে স্মরণ করুন।

এই ঘটনার মধ্যে আশ্চর্যের কথা এই যে, অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁর অলৌকিক শক্তি দ্বারা হরিহরবাবুকে দেখেই তাঁর পরিণতির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। হরিহরবাবু যদি ঠাকুরের কথামতো পাবনায় চলে আসতেন তাহলে তখনকার মত তাঁর মৃত্যুকে ঠেকান যেত।

শ্রীঠাকুরের প্রতিবেশী দুর্গানাথ সান্যাল একটি ঘটনার কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি বাংলায় ১৩১৪ সনে কিছুকাল জ্বরে ভুগবার পর প্রথমে পেটের রোগ ও পরে কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হই। প্রায় ছয় বছর ধরে পাবনা শহর ও কলকাতার বহু বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েও রোগের উপশম না হওয়ায় আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে বৈদ্যনাথ ধামে বাবা বৈদ্যনাথের কাছে হত্যা দেবার উদ্দেশ্যে দেওঘর গমন করি। সেখানে রোহিনী রোডের উপর 'ডক্টর লজের' একটি ঘর ভাড়া করে আমি রোজ বৈদ্যনাথ মন্দিরে হত্যা দিতাম। বৈদ্যনাথ ক্যাম্পাস টাউনের বালানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বালানন্দ স্বামীর কাছে যেতাম। তাঁর কাছে বসে তাঁর উপদেশ শুনতাম ও মনে মনে রোগমুক্তির প্রার্থনা জানাতাম। কিন্তু আমার আমাশয় রোগ আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমার শরীর ক্রমশ ফুলে উঠতে লাগল। আমি তখন ভগ্নহৃদয়ে বৈদ্যনাথ মন্দিরে হত্যা দিয়ে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট কেঁদে কেঁদে রোগ নিরাময়ের প্রার্থনা জানাতে লাগলাম।

হঠাৎ একদিন রাত্রি আড়াইটার সময় স্বপ্নে দেখি যে একজন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, ভদ্রবেশ পরিহিত ও উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আমাকে বলছেন, ভয় নেই, তোর এ রোগ বাড়ির কাছের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে যেয়ে নাম করলেই সারবে।

পরের দিন সকালবেলা আমি আমার তীর্থগুরু দেবীপ্রসাদ পাণ্ডার কাছে জানলাম যে বাবা বৈদ্যনাথের এইরকম স্বপ্নাদেশ হয়ে থাকে।

এরপর আমি আমার গ্রাম নাজিরপুরে ফিরে আসি। পরের দিন আমি আমার

সহপাঠী অন্নদা রায়কে সঙ্গে নিয়ে অনন্ত মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁকে একান্তে ডেকে দেওঘরের স্বপ্নাদেশের কথা জানালাম। তখন তিনি আমাকে অবিলম্বে আমাকে নিয়ে ঠাকুরের গৃহের দিকে যাত্রা করলেন। তখন ঠাকুর গৃহের বাইরে ছিলেন। আমি মা মনোমোহিনী দেবীকে আমার স্বপ্নাদেশের কথা জানালাম। মনোমোহিনীদেবী আমাকে নানা সুখাদ্য খেতে দিলেন। এমন সময় কোথা থেকে ঠাকুর ছুটে এসে মাতাকে বললেন, মা, দুর্গাদার না খাওয়ার দরুন এই রকম রোগ হয়েছে। যা ভাল লাগে তাই খাবে, খুব খাবে, তবেই রোগ সারবে। এরপর আমি তিন দিন ঠাকুরের বাড়িতেই রয়ে গেলাম এবং তাঁর সঙ্গে স্টীমার ঘাট ও গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলাম। আহারাদির পর অধিক রাত্রি পর্যন্ত কিশোরীমোহন দাসের বাড়িতে কীর্তন করতাম। এইভাবে আর কোন ওষুধ না খেয়ে ও যথেচ্ছ আহার করে আমার আমাশয় রোগ একেবারে সেরে গেল এবং বৈদ্যনাথ ধামের স্বপ্নাদেশ সফল হলো।

কিন্তু আমার কুলগুরু ছিল বলে আমি ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে পারলাম না। তবে বুঝতে পারলাম বাবা বৈদ্যনাথ স্বপ্নে যার নাম বলেছেন, তিনি সাধারণ মানুষ নন তিনি অবশ্যই এক দিব্যপুরুষ। তাঁর কৃপাতেই আমার রোগ সেরেছে। এরপর এক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমি ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করি।

একদিন রাত্রি দেড়টার সময় আমি আমার ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম। এমন সময় ঠাকুর একটি লণ্ঠন হাতে বাড়ির বাইরে থেকে 'দুর্গাদা' 'দুর্গাদা' বলে ডাকতে লাগলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ঠাকুরকে ঘরে এনে বসালাম এবং তামাক সেজে এনে দিলাম। ঠাকুর বসে বললেন, আপনি যাননি, তাই ভাল না লাগায় আপনাকে দেখতে এলাম। আমি তখন বললাম, আজ সন্ধ্যার সময় কয়েকবার পায়খানা হওয়ায় শরীরটা দুর্বলবোধ হচ্ছে বলে যাইনি। এরপর আমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তার পর ঠাকুর বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে আমি বললাম, আপনাকে একা ছাড়ব না, আমিও সঙ্গে যাব।

এই বলে আমি আমার স্ত্রীকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বলে আমি ঠাকুরের সঙ্গে হিমাইতপুরের দিকে চলতে লাগলাম। ঠাকুরের বাড়ির নিকট পদ্মার তীরের একটি ছোট ঘরে অনন্ত মহারাজ থাকতেন। সেই ঘরের কাছে যেতেই ঠাকুর আমাকে বললেন, আপনি ওই ঘরে যান আমি এখনি রোগী দেখে আসছি। এই বলে তিনি বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

আমি অনন্ত মহারাজের ঘরে গিয়ে ডাক দিতেই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ঘরের দরজা খুলে একযোগে ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজ বেরিয়ে আসছেন। আমি যেন আমার

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি অতিশয় বিস্মিত হয়ে ঠাকুরকে বললাম আপনি কি করে এখানে এলেন? আপনি আমার বাড়ি গিয়েছিলেন এবং আমার বাড়ি থেকে আমরা এক সঙ্গে এলাম, কত কথা হলো। তারপর আপনি আমাকে এই ঘরে যেতে বলে আপনি আমার চোখের সামনে আপনার বাড়ির দিকে চলে গেলেন অথচ আপনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঠাকুর কিন্তু সহজ সরলভাবে বললেন, আমি তো কোথাও যাইনি। এই ঘরে শুয়েছিলাম। অনন্ত মহারাজও বললেন, ঠাকুর তো আমার কাছে শুয়েছিল। উনি তো কোথাও যাননি। আমি তখন সে কথা বিশ্বাস না করে ঠাকুরের একটি হাত ও অনন্ত মহারাজের একটি হাত জোর করে বগলে চেপে ধরে তাদের নিয়ে ঠাকুরের বাড়িতে চলে গেলাম। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও ঠাকুরের দেখা পেলাম না। বাড়ি একেবারে নিঝুম অন্ধকার। বুঝলাম ঠাকুর সেখানে নেই। আমি তখন ঠাকুরের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আজ তুমি আমার কালী, দুর্গা, গৌর, কৃষ্ণ সব।

আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা চাইলে তিনি বললেন, মার উপর আদেশ হয়েছে তিনি দীক্ষা দেবেন। এর পর একদিন জননীদেবী মনোমোহিনীদেবী পদ্মার তীরে ঠাকুরের উপস্থিতিতে আমাকে দীক্ষা দান করলেন। আমারও সব রোগ ও দুর্বলতা চিরদিনের জন্য চলে গেল। বুঝতে পারলাম দেবতার নির্দেশ সত্ত্বেও আমি ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করিনি বলেই আমার রোগ কিছুটা কমলেও একেবারে সারেনি। আজ দীক্ষা গ্রহণ করে তাই পরম তৃপ্তি লাভ করলাম এবং সব রোগ নিঃশেষে সেরে যাওয়ায় দেহের মধ্যে বল খুঁজে পেলাম।

এটি নিঃসন্দেহে এক অলৌকিক ঘটনা এবং ঠাকুরের এ একটি লীলা। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি ঠাকুর প্রথাগত ও প্রত্যক্ষ ভাবে যোগসাধনা না করলেও তিনি সিদ্ধ যোগীদের মত সব যোগ বিভূতি লাভ করেছিলেন। তাই তিনি এক জায়গায় অবস্থান করেও সূক্ষ্ম শরীরে অন্যত্র গিয়ে এক অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করেন।

তখন ১৩২৬ সাল। একদিন রাত্রে আমি একটি পৃথক ঘরে নাম জপ ও ধ্যান করছিলাম। পাশের ঘরে আমার স্ত্রী ও তিন ছেলে শুয়েছিল। আমি ধ্যানে এমন মগ্ন হয়ে পড়ি যে বাইরের কোন শব্দ কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি ধ্যানের মধ্যে যে অনাহত নাদ বা শব্দ জপ করছিলাম তা আর এক সময় শুনতে পেলাম না। কারণ তখন পাশের ঘর থেকে তুমুল গোলমালের শব্দ আসছিল। সেইটাই শুধু শুনতে পাচ্ছি। জানলাম আমার তিন ছেলে চিৎকার চেঁচামেচি করায় আমার স্ত্রী তাদের খুব

প্রহার করেছে। তাই তারা খুব কাঁদছে। আমি তখন অতিশয় বিরক্ত বোধ করে ধ্যান করতে করতেই হাত জোড় করে পরমপিতার নিকট প্রার্থনা জানালাম, আমার ধ্যানের বিঘ্ন স্বরূপ এই সন্তানগণ মরুক। আমার আর তাদের দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই।

পরদিন সকালেই আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে আমার তিনটি ছেলে সর্দি কাশি ও জ্বর বিকারে ভুগছে। আমি তখনই ঠাকুরের কাছে গিয়ে সব কথা জানালাম।

আমার কথা শুনে শ্রীঠাকুর বললেন, দুর্গানাথদা, আপনি বড়ই অন্যায় করেছেন, আপনি ধ্যান করতে করতে ভাবাবস্থায় যে প্রার্থনা পরমপিতার কাছে জানিয়েছেন তা তো সত্য হবেই। আপনি নিজে উদ্ধার পেতে চান। আর আপনার যে পারিপার্শ্বিক পরমপিতার দান তাদের মৃত্যু চান। একই সঙ্গে এই স্ববিরোধী দুটি ইচ্ছা কী ভাবে পূরণ হতে পারে? কিভাবে দুই দিক রক্ষা হবে?

আমি তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝতে পেরে কোন একটা কিছু উপায় করার জন্য ঠাকুরের চরণে পড়ে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলাম।

ঠাকুর তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, পরমপিতাকে যখন জানিয়েছেন তখন তিনি একটিকে অবশ্যই নেবেন। দুটি সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এবার আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কোন সন্তানটিকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমি তখন সকলকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানালাম।

ঠাকুর বললেন, একটিকে ত্যাগ আপনাকে করতেই হবে। তবে আমার মনে হয় কনিষ্ঠটিকে ত্যাগ করা উচিত। কারণ তাকে অল্পদিন লালনপালন করেছেন। তাই কম ব্যথা লাগবে।

এরপর ঠাকুর আমার সব সন্তানদের জন্য ওষুধ দিলেন। কিন্তু দেখা গেল আমার প্রথম দুটি সন্তান সেই ওষুধে ক্রমশ ভাল হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কনিষ্ঠ সন্তানটির রোগ আরও বেড়ে যেতে লাগল। একদিন রোগ খুব বেশী বেড়ে যাওয়ায় আমি ঠাকুরের কাছে ছুটে গেলাম তাঁকে একবার আমার বাড়িতে গিয়ে রোগীকে দেখতে বললাম। ঠাকুর বললেন কোন ফল হবে না। কাল বেলা এগারোটার সময় ও মারা যাবে। আমি তার আগে সেখানে গেলে সে আরও আগে মারা যাবে।

আশ্চর্যের কথা পরদিন ঠিক বেলা এগারোটার সময় দুর্গানাথবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটি মারা গেল। কিন্তু ঠাকুরের এক আধ্যাত্মিক প্রভাবে কোন শোক দুঃখ অনুভব করতে পারলেন না দুর্গানাথবাবু। তাঁর সমস্ত শোক তাপ যেন পরম প্রেমময় ঠাকুর নিজের অন্তর দিয়ে সব শোষণ করে নিয়েছিলেন। তাই যেদিন বেলা এগারোটার সময় দুর্গানাথ

বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র মারা যায় সেদিন ঠাকুর নিজ বাড়িতে এমনভাবে কান্নাকাটি করতে থাকেন যাতে মনে হয় তাঁর নিজেরই পুত্রবিয়োগ হয়েছে।

একদিন আমার বিষয়সম্পত্তির শরিক ও সহপাঠী গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী আমার বাড়িতে এসে বলল, ঘরসংসার ও জোতজমা কিছু দেখ না, কেবল অনুকূল ঠাকুর ও তাঁর আশ্রম নিয়ে মেতে আছ। আমি তোমাকে আশ্রমছাড়া করবই।

আমিও তখন তাকে জোর দিয়ে বললাম, তুমি আমার আত্মীয় সহপাঠী ও বন্ধু, আমিও বলছি আমি তোমাকে আমার দয়াল ঠাকুরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করাবই।

গিরীন্দ্র লাহিড়ী সৎ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি কিছু কু-লোককে পরামর্শ দিয়ে আমার জোতজমা জোর করে দখল করায়।

আমিও সেদিন বিকালে ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁদের সব কথা জানালাম।

একথা শুনে ঠাকুর বললেন, সে তো এ জন্মে আমাকে ধরতে পারবে না পরজন্মে আমাকে ধরবে।

কিন্তু অনন্ত মহারাজ ঠাকুরকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, দুর্গাদা যখন বলে ফেলেছেন তখন তা তো করতেই হবে।

ঠাকুর তখন বললেন, তোমার ও দুর্গাদার কথায় সে দীক্ষা নেবে না। তবে কুষ্টিয়ার সতীশ জোয়ারদারকে যদি আনতে পার তবে সে তার কথায় দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অবশেষে হলোও ঠিক তাই। একদিন আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সতীশ জোয়ারদারের সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী নিজে এসে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করল। তার দীক্ষা গ্রহণের কিছু পরেই আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বুঝলাম পরপ্রেমময় দয়াল ঠাকুরের একবার যা ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা পরমপিতা পূরণ না করে পারেন না।

শ্রীঠাকুর একদিন হিমাইতপুর আশ্রমে বসে বেলা দশটার সময় গল্প করছিলেন। সামনে বহু লোকজন বসেছিল। এমন সময় তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'জলে ডুবল, জলে ডুবল।' আবার কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'না, বেঁচে গেল'। পরের দিন ঠাকুর পায়ে হেঁটে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হন। আমি ও অন্যান্য আরও অনেকে তাঁর সঙ্গে যেতে লাগলাম। অবশেষে কুষ্টিয়ায় পৌছে আমরা জানতে পারলাম যে কুষ্টিয়ার গুরুভাই উকিল প্রফুল্ল রায়ের পাঁচ ছয় বছরের একটি পুত্র আগেরদিন বেলা দশটার সময় জলে ডুবে গিয়েছিল, তবে জলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ তাকে খুঁজে পাওয়ায় এ যাত্রা সে বেঁচে যায়।

এইভাবে ঠাকুর তাঁর গুপ্ত যোগ বিভূতির ফলে দূরের জিনিসকে ও ঘটনাকে

প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। কিন্তু ঠাকুর প্রথাগতভাবে কোন যোগ সাধনা করতেন না। কেবল জন্মাবধি নাম জপের ফলেই তিনি এই সব অধ্যাত্ম শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

দুর্গানাথ সান্ন্যাল মশাইয়ের দীক্ষা গ্রহণের কয়েকদিন পর ১৩২০ সনের চৈত্র মাসে সন্ধ্যা আটটার সময় আহারাদির পর ঠাকুরের সঙ্গে পদ্মার তীরে অবস্থিত কুটীরের মধ্যে শুতে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির ভিতর বাড়ির আঙ্গিনা পার হলেই নদীর পার পর্যন্ত বিরাট ভাটি বন, তাতে কিছু আম-কাঁঠালের গাছও ছিল। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নদীতে যাবার একটা সরু পথ ছিল। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঠাকুর একসময় বলে উঠলেন, সতীশ এসেছে। দুর্গানাথবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, যোগী ঘোষের ছেলে সতীশ তো ৪/৫ দিন হলো মারা গেছে।

ঠাকুর তখন বললেন, এই দেখুন না, আপনার ও আমার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ঐ চলে গেল কিশোরীর বাড়িতে কীর্তন করতে।

দুর্গানাথবাবু আগের মতই বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। আপনি মরা মানুষ দেখলেন কী করে?

ঠাকুর তখন বললেন, নাম করুন, তাহলে আপনিও দেখতে পাবেন ও জানতে পারবেন যে মৃত্যুর পরেও জীবিতের মতই তারা সব কিছু করে। খুব করে নামধ্যান করলে ইহ ও পরলোকের সব তত্ত্বই সহজে আপনাদেরও জানার মধ্যে এসে যাবে।

একদিন সকালে ঠাকুরের বাড়িতে সঙঘভ্রাতা নফরচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছিলেন। তখন সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত আত্মাদের গতিবিধি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল। ঠাকুর একসময় বললেন, মৃত সৎ সঙ্গীদের আত্মা রোজ আসে আমার কাছে।

নফরচন্দ্র তখন বললেন, সতীশও কী আসে?

ঠাকুর তখন বললেন, হ্যাঁ রোজই আসে।

সতীশ ঘোষ ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত এবং নফরচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নফরচন্দ্র তখন ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন, এবার সতীশ এলে দেখাতে পারবেন, আহা কতদিন তাকে দেখিনি।

শ্রীঠাকুর তখন মৃদু হেসে বললেন, ঠিক আছে, কাল যখন আসবে, তোকে তখন ডাকব।

পরের দিন সকাল ৮টায় ঠাকুর সহসা নফররে, নফররে বলে ডেকে বললেন, সতীশ এসেছে দেখবি আয়।

নফরচন্দ্র তখন ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন ঠাকুর তাঁর বিছানায় শুয়ে আছে আর

সতীশের মত অবিকল একটি মনুষ্যমূর্তি তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। এই দেখে নফরচন্দ্র ভীত হয়ে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরলেন। সতীশের সঙ্গে কথা বলতে আর সাহস পেলেন না। এদিকে তখন সতীশের ছায়ামূর্তিটি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ল।

ঠাকুর তখন নফরচন্দ্রকে ভৎর্সনা করে বললেন, তুই এত ভয় পেলি কেন? সতীশ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেল।

১৩২২ সালের এক রাত্রির কথা। তখন রাত প্রায় দেড়টা পদ্মাতীরের কুটীরের মধ্যে ঠাকুর এক চৌকিতে শুয়েছিলেন। অনন্ত মহারাজ ও দুর্গানাথবাবু পৃথক পৃথক আসনে বসে নামধ্যান করছিলেন। সহসা ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে দৌড়তে লাগলেন। তিনি ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলেন, পরমপিতা, তোমার কাজ কিরূপে করব? লোক পাচ্ছি না। তখন অনন্ত মহারাজ ও দুর্গানাথবাবু ঠাকুরের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে একেবারে পদ্মার তীরবর্তী শ্মশানভূমিতে পৌছলেন। তাঁরা দেখলেন ঠাকুর সেই শ্মশান ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে লাগলেন, হে পরমপিতা, মানুষ পেলাম না। আমি থেকে কি করব। আমি যাই। আমি যাই।

তখন অনন্ত মহারাজ ও দুর্গানাথবাবু ঠাকুরের পা দুটো জড়িয়ে আর্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঠাকুর তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না। তুমি চলে গেলে আমরা বাঁচব না। তখন তাঁরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে মুখ তুলে দেখলেন ঠাকুরের মুখমণ্ডল থেকে সার্চ লাইটের মত এক তীব্রজ্যোতি নির্গত হয়ে আকাশ স্পর্শ করে আছে। সেই আলোয় চারদিকের অন্ধকার অপসারিত হয়ে সব আলোময় হয়ে উঠেছে। আর আকাশের সাদা মেঘগুলি গোলাপী আভাযুক্ত দেখাচ্ছে। ঠাকুরের প্রশস্ত ললাট আয়নার মত স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুরের সহজ জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানি থর থর করে কাঁপতে লাগল এবং দেহখানি অবশ হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। তখন দুজনে কাঁধে ভর দিয়ে ঠাকুরকে সেই কুটীর মধ্যে নিয়ে এলেন। ক্রমে ক্রমে ঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ডাক্তার কিশোরীমোহনের বাড়ীতে একদিন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটিকে শ্রীঠাকুরের এক অলৌকিক লীলাও বলা যায়। সেদিন ফরিদপুর থেকে কিশোরী-মোহনের বাড়ীতে চোদ্দজন অতিথি আসে। তখন কিশোরীমোহনের বাড়িতে অতিথি সৎকারের কিছুই নাই। হাতে টাকা পয়সাও নেই। তিনি তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের পটমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ আকুল ভাবে ক্রন্দন করলেন তারপর ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর তিনি এমন এক তীব্রজ্যোতির দর্শন করলেন যা

কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়। সেই সঙ্গে নানা মধুর শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর তাঁর মনে হলো তিনি যেন এক বক্র ছিদ্রপথ দিয়ে আকাশে উঠে গেলেন এবং সেখানে এক সুমধুর বংশী ধ্বনি শুনতে পেলেন। এই বংশী ধ্বনি শোনার পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলো। বহু লোকের চিৎকার ও ডাকাডাকিতেও সে জ্ঞান ফিরে এলো না। অবশেষে বহুক্ষণ এই ভাবে থাকার পর তিনি স্বাভাবিক বাহ্য জ্ঞান ফিরে পেলেন।

এমন সময় ডাকপিওন পঁচিশ টাকার এক মনিঅর্ডার নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলো। সতীশচন্দ্র গোস্বামীর পাঠানো মনিঅর্ডারটি কিশোরীমোহনের নামে এসেছে।

এই ঘটনার কিছু পরেই কিশোরীমোহনের বাড়িতে ঠাকুর এসে কিশোরীমোহনকে বললেন, কী ডাক্তার মনিঅর্ডার এলো? কার নামে এলো?

কিশোরীমোহন এই সব ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং ঠাকুরের মুখপানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এই সব কিছু ঠাকুরের এক লীলা।

তখন শ্রীঠাকুর হাসি মুখে বললেন, শোন ডাক্তার, আকুল প্রাণে ডাকলে জ্যোতিঃদর্শনও হয়। বাঁশীও শোনা যায়, টাকাও পাওয়া যায়, অবিশ্বাস করো না ডাক্তার। এই টাকা এখন খরচ করো। কিন্তু যার টাকা তাকে শীঘ্র দিও।

তখন অতিথি সৎকার সুন্দররূপে হলো এবং পরে তিনি টাকা শোধও করেছিলেন।

কোন এক রাতে কিশোরীমোহনের মনে কোন এক নিষিদ্ধ কাজ করার এক কুপ্রবৃত্তি জাগল। বাধা না পেলে হয়তো সে কাজটি তখনই অনুষ্ঠিত হতো। আশ্চর্যের কথা, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একদল মৌমাছি এসে তাঁর বিছানায় লেপের মধ্যে ঢুকে শায়িত কিশোরীমোহনকে বার বার দংশন করতে লাগল। তিনি তখন ভাবলেন এ তাঁর দয়াল গুরুর অসীম কৃপা। এই কৃপার দ্বারা তিনি তাকে কুকর্ম হতে নিবৃত্ত করলেন। তাই দেহগত ভীষণ যন্ত্রণার মাঝেও এক অপার আত্মিক আনন্দ অনুভব করলেন। এই ঘটনার কথা তিনি কারোর কাছে প্রকাশ করলেন না।

পরদিন ভোরবেলায় ঠাকুর কিশোরীমোহনের বাড়ীতে এসে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার, মৌমাছির কামড় কেমন লাগলো?

কিশোরীমোহন তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে তোমাকে বলল যে আমাকে মৌমাছি কামড়েছে?

শ্রীঠাকুর তখন তাঁর নিজের শরীরটি কিশোরীমোহনকে দেখালেন। কিশোরীমোহন দেখলেন, তার শরীরের যে যে স্থানে মৌমাছি কামড়েছে, ঠাকুরের শরীরেও সেই সেই

স্থানে মৌমাছির দংশনের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কৃপাময় ঠাকুরের এই লীলা দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না কিশোরীমোহনের। ঠাকুর যে অন্তর্যামী এবং তিনি প্রতিটি ভক্তের দেহগত ও মনোগত বেদনাকে নিজের দেহমনের মধ্যে এমন নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেন তা আগে কখনো জানতে পারেননি কিশোরীমোহন। আজ তা প্রথম জানতে পেরে ঠাকুর যে ঈশ্বরের অবতার, সে বিষয়ে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠল তাঁর মনে।

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তার একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলেন। ঠাকুর তখন কলকাতার হরিতকী বাগান লেনের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করছিলেন। একদিন আমি ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য সে বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি একটা বড় ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর সঙঘভ্রাতা ডাঃ শশিভূষণ মিত্রের কোলে মাথা রেখে এবং পা দুখানি নগেন ঘোষাল মহাশয়ের কোলে তুলে শুয়ে আছেন। আর তাঁরা দুজনে ঠাকুরের পরিচর্যা করছেন। ঘরে ঢুকে আমি নগেনদার পাশে গিয়ে বসলাম। আমার একান্ত ইচ্ছা হলো আমি ঠাকুরের পদসেবা করি। আমার বাসনা এত প্রবল হলো যে আমি ঠাকুরের একখানি পায়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাত বোলাবার সুযোগ করে দেবার জন্য নগেনদার কাছে বার বার প্রার্থনা জানাতে লাগালাম।

নগেনদা তখন আমার কানে কানে এসে বললেন, দেখ ভাই অমন করতে নেই। শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হলে তিনি নিজেই তোমাকে সুযোগ দেবেন। নচেৎ আমাদের নিজেদের খেয়ালে কোন কাজ করা উচিত নয়।

কিন্তু আমার বাসনা এমনই দুর্দমনীয় হয়ে উঠল যে তা আর চেপে রাখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল নগেনদার নিষেধ অমান্য করেই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করবো তাতে যা হবার হবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে অন্তর্যামী ঠাকুর যেন আমার মনের কথা জানতে পেরেই হঠাৎ উঠে এসে আমার কোলের উপর কিছুক্ষণ বসে রইলেন। আমার বহুক্ষণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ণ হওয়ায় আনন্দাশ্রুতে আমার চোখ দুটি ভরে গেল। ঠাকুরের এই পরচিত্তাভিজ্ঞতা অর্থাৎ অপরের চিত্তের যে কোন চিন্তাভাবনাকে বুঝতে পারার ক্ষমতা সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথ বাবু আর একটি ঘটনার কথা বলেছেন। তিনি নিজের কথায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, আর একদিনের কথা। ঠাকুর তখন খড়ম পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতেন। চলতে গিয়ে হঠাৎ একবার তার একটি পা মচকে যায়। এতে পা ফুলে গিয়ে তাতে পুঁজ জমে বিষিয়ে যায়। এই অবস্থায় ঠাকুর একদিন সকালবেলায় ঘরের বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে বসেছিলেন এবং কয়েকজন তাঁর আশেপাশে বসেছিলেন। গতরাতে

তাঁর ঘুম না হওয়ার জন্য তাঁকে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছিল। এমন সময় পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাতে শিউলিফুলের মালা নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর গলায় পরিয়ে দিতে চাইল। উপস্থিত ভক্তেরা এতে কী বলবেন কী করবেন তা বুঝতে পারলেন না। কোন সাধারণ মানুষ এমন অসুস্থ অবস্থায় কখনো মালা পরতে চাইতেন না এবং শিশুগুলিকে ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু প্রেমময় ঠাকুর সানন্দে প্রতিটি শিশুর মালা গলায় পরলেন এবং প্রতিবারই গলা থেকে সেই মালাদানকারী শিশুর গলায় পরিয়ে দিলেন। এতে তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি বোধ করলেন না। শিশুরা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেল। এক অসাধারণ ধৈর্য ও প্রেমময়তা পরিষ্কার ফুটে উঠল ঠাকুরের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে। সবশেষে আর একটি শিশু একটি অতি সুন্দর মালা এনে ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিল। কেন জানি না মালাটির উপর আমার বড় লোভ হলো। এই অন্যায় লোভ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঠাকুরের কাছে আমি মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, ঠাকুর যেন অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো এই মালাটিও তাকে পরিয়ে দেন। ঠাকুর গলা থেকে মালাটি তুলে নিয়ে একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নাঃ, এই মালাটা তুই পর।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার মনের অতিসূক্ষ্ম ক্ষীণ একটি বাসনার কথা ঠাকুর কী ভাবে জানতে পারলেন এবং তা পূরণ করলেন তা আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

তখন আশ্রমে পাওয়ার হাউস স্থাপিত হয়েছে, সমগ্র আশ্রমটি সারারাত্রি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত থাকে। তড়িৎ ভবনে ডাইনামোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কয়েকজন কর্মী সারারাত্রি সেখানে পাহারায় থাকত, যাতে হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটে। এরকমই একদিন সঙ্ঘভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পাহারা দিতে ডাইনামোর কাছে বসেছিলেন এবং মাঝে মাঝে হাত দিয়ে তা অত্যাধিক গরম হয়ে উঠছে কিনা লক্ষ্য রাখছিলেন। রাত্রি তখন দুটো। এমন সময় হঠাৎ বীরেন্দ্রনাথের একটু তন্দ্রা এলো এবং ঘুমের ঘোরে টলতে থাকেন এই অবস্থায় তাঁর হাতখানি ডাইনামোর সংলগ্ন বেল্টের উপর পড়ে। এতে তাঁর হাত পিষে যাবার এমনকি মৃত্যুরও সম্ভাবনাও প্রবল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঠাকুর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে পদ্মাতীরস্থ আশ্রমের ঘর থেকে ছুটে এসে বীরেন্দ্রনাথের হাত ধরে টেনে তাঁকে দূরে ফেলে দেন। এই ভাবে বীরেন্দ্রনাথের জীবন সেদিন আকস্মিকভাবে রক্ষা পায়।

পরের দিন সকালে বীরেন্দ্রনাথের মুখে এই ঘটনার কথা শুনে আমরা বিস্ময়ে

অভিভূত হয়ে পড়ি এবং সর্বজ্ঞ শ্রীঠাকুরের চরণে বার বার প্রণাম জানাই।

শ্রীঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, লোকের বিপদ-আপদগুলো আমার চোখের সামনে এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা বলবার নয়। সে বিপদ যত দূরেই হোক আমি তা দেখতে পাই। সেবার দেখলাম, কিশোরীর কোন কলেরা রোগীর বাড়ি থেকে ডাক এসেছে, কিশোরী সেই রোগী দেখতে যাচ্ছে, মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ, সেই পথে একটা বিষধর সাপ রয়েছে। কিশোরীকে কামড়াবে নিশ্চয়। যেই দেখা অমনি এক দৌড়ে ছুটে গেলাম কিশোরীর বাড়ি। গিয়ে দেখি সত্যি সত্যিই দুটি লোক এসেছে ডাক্তারকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিশোরীর যাত্রাসময়ে, একটু বিলম্ব ঘটাবার উদ্দেশ্যে, কিশোরীর জুতা জোড়াটি তাড়াতাড়ি সকলের অলক্ষিতে পাশের মানকচু বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। ডাক্তার ভিতরবাড়ি থেকে বাইরে এসে যাওয়ার জন্য জুতো খুঁজতে লাগল। কিন্তু এখানে ওখানে খুঁজেও তা কিছুতেই না পেয়ে কিশোরী রেগে আগুন হয়ে গেল। এইভাবে কিছুটা সময় পার হয়ে গেলে, আমি তাকে মানকচুর বনে জুতো খুঁজতে বললাম। ডাক্তার অবশেষে জুতো পেয়ে রোগীর বাড়ীর দিকে রওনা হলো। আমিও তার সঙ্গে চললাম। পথে গিয়ে দেখি এক প্রকাণ্ড বিষধর সাপ প্রায় বিশ হাত দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিশোরীদা যদি বাড়ি থেকে তক্ষুনি রওনা হতো, তবে রাস্তায় সাপের মুখে পড়ে তার প্রাণ বিপন্ন হতো। কিন্তু কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় তার বিপদমুহূর্তটি কেটে যায়। সে যাত্রা পরম পিতার দয়ায় সে রক্ষা পায়।

এই ঘটনা থেকে ঠাকুরের দূরের জিনিসকে প্রত্যক্ষ করার এক অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার পাবনায় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যাপারে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রায় দু সপ্তাহ ধরে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছিল। রাস্তাঘাটে হিন্দুদের বের হবার উপায় ছিল না। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য বহু হিন্দুর প্রাণ গেল, আবার বহু লোকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হলো। সে সময় আশ্রমে লুঠতরাজ ও ঠাকুরের প্রাণ নাশ করে সৎসঙ্গ আশ্রমটি উচ্ছেদ করার জন্য বিদেশাগত দুষ্কৃতকারী মৌলবীরা ষড়যন্ত্র করছিল। এই জন্য তারা স্থানীয় সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানগণ ঠাকুরের কাছ থেকে অর্থ চিকিৎসা ও নানাভাবে নানারকম উপকার পেয়ে আসছিল যে তারা ঠাকুরের মত এক মহানুভব পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু অবশেষে তারা বিনা আয়াশে নারী ও প্রচুর ধনরত্ন পাওয়ার আশায় প্রলুব্ধ হয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। শেষে একদিন তারা আশ্রম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। সন্ধ্যার সময় প্রায় দুই সহস্র মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি

দিতে দিতে আশ্রমের দিকে এগিয়ে আসছিল।

ঠাকুর তখন এক প্রশস্ত গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে একাকী আশ্রমের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল চারদিকের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় ও আসন্ন মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা তার নির্বিকার চিত্তে কিছুমাত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। তখন মনে হচ্ছিল তিনি মানুষ হয়েও যেন এক বিরাট ঐশীশক্তির মূর্ত প্রতীক। দুর্বৃত্তেরা আশ্রমের পূর্ব দ্বারে দলবদ্ধভাবে এসে দেখল তাদের সামনে পরম দয়ালু ও দরদী ঠাকুর ভাবগম্ভীর মূর্তিতে অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে কোন অস্ত্র নেই। এই দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল তারা। এই সময় বিদেশী মৌলবীরা দাঙ্গাকারীদের বারবার উত্তেজিত করতে লাগল। এমন সময় ঠাকুর আশ্রমে নির্দেশ পাঠালেন আশ্রমের মধ্যে কারো হাতে যেন কোন অস্ত্র না থাকে। এবং আশ্রম দ্বারের নিকট যেন একটি আলো ঝুলিয়ে রাখা হয়।

অবশেষে মৌলবীদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে মুসলমান দাঙ্গাকারীরা আশ্রম আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়ে বাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মার মার শব্দে ছুটে আসতে লাগল। আশ্রমবাসীরা তখন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে। আর ওদিকে ঠাকুরও পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মুখ থেকে কোন প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের একটা কথাও বার হলো না। মনে হলো তিনি তাঁর আশ্রম ও নিজের সমস্ত ভার পরম পিতার উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক এই সময় আশ্রমের পিছন দিক থেকে ভারী বুটের খট্‌খট্‌ আওয়াজ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে একদল মিলিটারী ফৌজ আশ্রমের পিছন থেকে এসে বাঁধের উপর তাদের বন্দুকের সঙ্গীন উঁচিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। তা দেখে দুর্বৃত্তরা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। এরপর মিলিটারি দলটি গোটা আশ্রম প্রদক্ষিণ করল এবং পরে ঠাকুরের সামনে গিয়ে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

অকস্মাৎ এই মিলিটারী ফৌজ কোথা থেকে এলো এবং কোথায় তারা চলে গেল তা এলাকার মানুষেরা কেউ বুঝতে পারল না। সেই থেকে সারা অঞ্চলের মুসলমানরা বিদেশী মুসলমানদের সমস্ত প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে ঠাকুরকে বেশি করে শ্রদ্ধা করতে লাগল। বুঝতে পারল এই মহান পুরুষের ক্ষতি করার সাধ্য কারোর নেই। কারণ স্বয়ং আল্লা তার সহায়।

তখন ১৯৪৭ সালের বৈশাখ মাস। ঠাকুর সেইবছর পাবনা থেকে দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামে এসেছেন। একদিন সঙ্ঘভ্রাতা ব্রজেনবাবুকে ডেকে বললেন, কিছুদিনের

মধ্যেই তোমাদের ওখানে (ঢাকা অঞ্চলে) এক বীভৎস হত্যালীলা ঘটবে। তুই এমনভাবে সংগঠন কার্য করবি যাতে এই হত্যালীলা সংঘটিত হতে না পারে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। আমাদের অঞ্চলের এক বিশিষ্ট মুসলমান নেতা কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে মিছিল ও অন্যান্য ব্যাপারে নেতৃত্ব দেওয়ার পর ঢাকায় গিয়ে দাঙ্গা বাধান। এই দাঙ্গার সময় ব্রজেনবাবুর জীবনে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে তার বিবরণ তিনি নিজে দান করেন। তখন আমাদের গ্রামের আশেপাশে ভীষণ দাঙ্গা চলছিল। সেদিন দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য আমি ঢাকা থেকে বাড়ি যেতে পারলাম না। চারদিক থমথম করছে। সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত। পরদিন সকালে পুলিশ সাহেব মি. ডি.বি. চ্যাটার্জী একদল সশস্ত্র কনস্টেবল সহ আমাকে নদী পার করিয়ে দেন। তার পর তিনি দাঙ্গা তদন্তে যান। এ সময় হঠাৎ মুসলমান কনস্টেবলদের একজন আমার প্রাণনাশের জন্য বন্দুকের গুলিতে আমার চোয়াল এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় তখন আমি রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ি। আমাকে তখন পুলিশ সাহেব ঢাকা হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য নৌকায় তুললেন। তখন আমার মধ্যে একটুখানি ক্ষীণ চেতনা ছিল। আমি আমার অন্তিমকাল আসন্ন বুঝতে পেরে আমার সেই অবশিষ্ট চেতনার সব শক্তি দিয়ে ঠাকুরের নাম করতে লাগলাম। বারবার মনে মনে বলতে লাগলাম আমি তো তোমার নির্দেশে এখানে এসেছি। তবে কেন আমার এমন হলো। তুমি বলেছিলে তোমার সন্তানদের কখনো অপমৃত্যু হতে পারে না। তবে কেন আমার এমন হলো।

এই বলে আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে নাম করতে লাগলাম। সহসা এক সময় চোখ খুলতেই দেখি শ্রীঠাকুর আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, তোর কোন ভয় নেই। আমি তোকে রক্ষা করব।

আমি আরও দেখলাম শ্রীঠাকুরের সঙ্গে বড়মাও রয়েছেন। তাঁদের মুখ যেন পুড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি ঠাকুরকে তাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, পরের ষাট হাজার বছর, আর ব্রহ্মার এক মুহূর্ত।

আমার কান্না ও কথাবার্তা শুনে নৌকায় উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হয়ে উঠলো। কারণ সেখানে ঠাকুরকে তারা দেখতে পায়নি।

যাইহোক আমি কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগের পর সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে উঠলাম। বুঝলাম সাধারণ মানুষ ষাট হাজার বছর ভোগে, পরম ব্রহ্ম ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে তা ভুগে শেষ করতে পারে। তাঁর দয়া না হলে সে যাত্রা কিছুতেই রক্ষা পেতাম না।

এই ঘটনাতে দেখা যায় ঠাকুর দেওঘর থেকে ব্রজেনবাবু অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসের বিপদ স্বচক্ষে দেখতে পান এবং তাই দেখে তিনি সূক্ষ্ম শরীরে দেওঘর থেকে

ঢাকায় এসে ব্রজেনবাবুকে অভয় দিয়ে তার প্রাণরক্ষা করেন।

সঙ্ঘভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকুমার দাস আর একটি ঘটনার কথা বলেন। তিনি নিজের ভাষায় বলেন, একবার আমি আমার স্ত্রী ও দেড়মাস বয়স্ক আমার কন্যাকে নিয়ে নৌকায় করে ফরিদপুর হয়ে পদ্মানদী দিয়ে আশ্রমে আসছিলাম। যখন আমরা পদ্মা নদীর মাঝখানে এসে পড়েছি ঠিক তখন প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়। অসংখ্য বড় বড় ঢেউ-এর ঘাত-প্রতিঘাতে ভয়ঙ্করভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল পদ্মানদীর বুক। এই অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনে নৌকার বাইরে এসে আমি নিবিষ্টচিত্তে নাম করতে লাগলাম। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম ঠাকুর খালি গায়ে আমাদের নৌকার সম্মুখভাগে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি বিপদের কথা একেবারে ভুলে গেলাম, কেবল নাম করে যেতে লাগলাম।

এমন সময় দেখলাম নৌকাখানি ঝড়ের আঘাতে তড়িৎবেগে তীরের দিকে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকাটি একটি চড়ায় গিয়ে ধাক্কা মারতে আমার ধ্যানভঙ্গ হলো। তখন আমি নাম বন্ধ করে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম কী গো পদ্মার ঢেউ দেখে ভয় পাও নি তো। এত ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাত সত্ত্বেও আমাদের নৌকায় একটুও জল ঢোকেনি। কিন্তু আমি নাম বন্ধ করায় হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে আমাদের নৌকার অর্ধেকটা ডুবিয়ে দিল এবং তার ফলে আমাদের জামাকাপড় ভিজে গেল। বুঝলাম নামের মহিমায় যেমন নির্বিঘ্নে উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ পদ্মানদী পার হওয়া যায় তেমনি নাম বন্ধ করলে নিরাপদ অবস্থাতেও অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ এসে দেখা দিতে পারে।

এখানে ঠাকুর দুর থেকে অনুরাগী ভক্তের বিপদের কথা বুঝে সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে।

কলকাতার নিউ আলিপুর ৯৮ই নলিনী রঞ্জন এভিনিউ নিবাসী সঙ্ঘভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বৈদ্য মহাশয় তাঁর নিজ জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা বলেন।

তখন ১৯৩৫ সাল। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে পাবনার সৎসঙ্গ আশ্রমে গিয়ে দুই দিন অবস্থান করি। তারপর ফেরার সময় ঠাকুরের কাছে গিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। এই সময় ঠাকুর সহসা আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কীরে মা, কিছু বলবি। মনে হলো ঠাকুর যেন অন্তর্যামী রূপে আমার স্ত্রীর মনের অব্যক্ত গোপন কথাটি জানতে পেরেছেন। কিন্তু আমার স্ত্রী লজ্জায় সে কথা প্রকাশ করতে না পেরে ঠাকুরের কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে মুখ নামিয়ে রইল। আমি তখন ঠাকুরকে বললাম, বিয়ের ৭/৮ বছর হতে চলল। ওর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় ওর মনে খুব কষ্ট, হয়তো এই কথাই

বলতে চায়। ঠাকুর তখন বললেন, তোর বয়সই বা কত, তোর চিন্তাই বা কি আছে। ছেলেমেয়ে তোর নিশ্চই হবে।

সিদ্ধবাক মহাপুরুষ ঠাকুরের কথামতো সেই বছরই আমার এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এরপর একটি পুত্র ও কন্যাসন্তানের জন্ম হয়।

আমার পুত্র সন্তানটি জন্মানোর পর বিখ্যাত জ্যোতিষী দিয়ে তার কোষ্ঠী করানোর পর জানা গেল, যে পুত্র সন্তানটি অত্যন্ত অল্প আয়ু নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে।

শ্রীঠাকুরের চরণে এই কথা নিবেদন এই কথা করাতে তিনি বললেন, ওর সিংহ রাশি তো? ওর সব ভালই হবে। অল্পআয়ুতে কিছু এসে যাবে না।

ঠাকুরের এই অভয় বাণীতে আমি আশ্বস্ত হয়ে ভাবলাম, আমাদের পুত্র হবার কোন আশা ছিল না। তাঁর আশীর্বাদেই যখন পুত্র হয়েছে তখন শত অনিষ্ট থাকলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। তাঁর কৃপায় এ সন্তান নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী হবে। আমরা তখন কাজের জন্য রেঙ্গুনে থাকতাম। আমি তখন বর্মা গভর্মেন্টের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট। তখন ওখানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই সময় একদিন আমার পাঁচ মাস বয়সের শিশু পুত্রটির জ্বর দেখে ভীত হয়ে পড়লাম। দু একদিনের মধ্যে তার গায়ে বসন্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষার পর জানা গেল বসন্ত রোগের এই টাইপটি মারাত্মক। এই শিশুটির জীবনের আশা করা চলে না। এই অবস্থায় আমি ঠাকুরকে একখানি পত্র লিখলাম। এর ৪/৫ দিন পর ঠাকুরের নিকট থেকে করুণামাখা পত্র পেলাম। সেই পত্রে তিনি জানান, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই উপযুক্ত হবে আর চন্দনঘটিত ওষুধ ব্যবহার করাই শ্রেয় হবে, কোন উগ্র ওষুধ যেন ব্যবহার না করা হয়।

শ্রীঠাকুরের এই পত্র পেয়ে আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পাওয়া এই অঞ্চলে বড় কঠিন। তারপর চন্দনঘটিত ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে তাও বুঝতে পারছিলাম না।

এই রকম যখন ভাবছি তখন আমারই এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই একটি স্থানীয় লোকের সন্ধান দেয় যে চন্দন জড়ি বুটি দিয়ে ওষুধ তৈরী করে বসন্ত রোগের চিকিৎসা করে। তাকে ডেকে আনা হয়। সে শিশুটিকে নানাভাবে পরীক্ষা করার পর তার চিকিৎসার ভার নিতে রাজি হয়। কিন্তু আমি আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যায় অপারদর্শী একজন দেশীয় লোকের হাতে শিশুপুত্রের চিকিৎসার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে কিছুটা ইতস্তত করছি দেখে সে নিজেই শিশুটির গায়ে ওষুধ মাখিয়ে দেয়। প্রথমে শিশুটি অসুস্থ বোধ করলেও পরে আরাম বোধ হওয়ায় ঘুমিয়ে

পড়ে। এই ভাবে চিকিৎসা চলতে থাকায় দেখা যায় যে বসন্তের গুটি আর বাড়ল না। ক্রমেই সেগুলো শুকাতে শুরু করল। আর পূর্বেই যে গুটিগুলো হয়েছিল সেগুলো পাকতে শুরু করে। এই অবস্থায় একদিন বিকালে ঐ দেশীয় চিকিৎসক আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে সেই গুটিগুলি কাঁটা দিয়ে ফাটিয়ে দেয়। তার চলে যাবার পর রোগীর অবস্থা আবার ভীষণ রকম খারাপ হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞ অ্যালাপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ ঘোষ শিশুকে পরীক্ষা করে বলেন যে শিশুটি দুঘন্টার বেশি বাঁচবে না। বাড়িতে হুলুস্থূল পড়ে গেল। আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে একমনে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম, হে ঠাকুর তুমি তো বলেছিলে ওর সব ভাল হবে। অল্প আয়ুতে কিছুই এসে যাবে না, তোমার কথা কি মিথ্যা হবে? জ্যোতিষীর কথাই ঠিক হবে? তাও কি কখনও হতে পারে? হে ঠাকুর তুমি দয়া কর। বালকের প্রাণ ভিক্ষা দাও। এই ভাবে জানাতে জানাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় আমি দেখি ঠাকুর সাদা চাদর গায়ে, পরনে সাদা ধবধবে ধুতি, পায়ে কাল চটি জুতো ও হাতে একখানা লাঠি নিয়ে বাতাসে ভর দিয়ে অমিত বেগে ছুটে এসে আমার ঠাকুর ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে শিশুটির শয়নকক্ষে প্রবেশ করে এক পা খাটের নিচে মেঝেতে অপর পা শিশুটির মস্তকের সন্নিকটে স্থাপন করে গুরুগম্ভীর গলায় বলছেন, আমি এখানে দাঁড়ালাম, দেখি একে কে নিতে পারে।

এইভাবে অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরে আসতে শিশুটির শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখি গুরুভায়েরা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মণিদা শিশুর নাড়ী পরীক্ষা করে আশ্বাস দিল নাড়ীর গতি ভালই। ডাক্তার ঘোষ আবার এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, বিপদ কেটে গেছে। এরপর ৩/৪ দিনের মধ্যে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

ডাঃ ব্রজেন্দকুমার দাস আর একটি ঘটনার কথা বলেন। সেবার কুষ্টিয়ায় ঠাকুরের জন্মোৎসবে যোগদান করার জন্য স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে যাওয়া মনস্থ করলাম। সহ প্রতিঋত্বিক রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর উৎসাহে ঠিক করি আমরা জলপথে ঠাকুরের দর্শনে যাব। এই উদ্দেশ্যে দুখানা নৌকা ভাড়া করে আমরা ও রমেশদার পরিবার একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করি। মাঝিরা বলল সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা সেখানে পৌছে যাব। এইভাবে চলতে চলতে আমরা কুষ্টিয়া নদী যেখানে পদ্মায় মিশেছে সেখানে এসে পড়লাম। সেখানে এক ভয়ানক বিপদ ঘটল। আমাদের নৌকা প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে। বৈঠাখানা ভেঙে যাওয়ায় নৌকা সেই স্রোতে দুবার পাক ঘুরে কোনদিকে যে ছুটে চলল তা ঠিক করা গেল না। অবশেষে তখন এক জায়গায়

উপস্থিত হলাম যেখানে চারদিকে শুধু জল আর জল। লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। মৃত্যু অবধারিত জেনে মনে মনে ঠাকুরের শরণ নিলাম। আমার স্ত্রী তার তিন শিশুপুত্র ও ছোটভাইঝিকে কোলের কাছে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বীজমন্ত্র জপ করতে লাগল। অন্যান্য যাত্রীরা রক্ষা কর হে ঠাকুর বলে কাঁদতে লাগল। যাই হোক মাঝিদের নির্দেশ দিলাম নৌকা যেদিকেই যাক সেইদিকেই চালাতে, যেন কোন লোকালয়ে অন্তত পৌছানো যায়। ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। আমার অবস্থা তখন অর্ধমৃতের মতো। এমন সময় দূরে আলোক দেখা গেল। সঙ্গে দুবার ফাঁকা বন্দুকের আ্যাওয়াজ ও সঙ্গে বহু কণ্ঠে 'বন্দে পুরুষোত্তম' ধ্বনি। মনে খানিকটা হলেও সাহস ফিরে পেলাম। তারপর শুনলাম আমার নাম ধরে কারা যেন ডাকছে। তখন আমিও তাদের উত্তরে সাড়া দিয়ে দেখলাম বঙ্কিমদার নেতৃত্বে জনা তিরিশ গুরু ভাই দুইখানি নৌকা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এরা ঠাকুরের স্বস্তি বাহিনী।

তারা এসেই আমাদের নৌকার মাঝিদের বলল, তোমরা নৌকা এখানে এনেছো কেন? তোমরা জাননা এটা ডাকাতের আড্ডা, এখানে যাত্রীদের মেরে ফেলে তাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে নেয়।

মাঝিরা তার কোন সদুত্তর দিতে পারল না।

অবশেষে স্বস্তিবাহিনীর সঙ্গে চলে আমরা আশ্রমের নিকট পদ্মার ঘাটে এসে পৌছলাম। রাত্রি তখন দুটো। দেখলাম ঠাকুর পদ্মার ধারে উৎকণ্ঠিত হয়ে ছোটাছুটি করছেন। আশ্রমে পৌছে ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, তোদের জন্য চিন্তা করতে করতে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তবুও তোরা একটু সাবধানে চলিস না।

অন্তর্যামী, বিপদতারণ ঠাকুর যদি সেদিন যথাসময়ে লোক পাঠিয়ে আমাদের রক্ষা না করতেন তাহলে সেই দিন আমাদের ধনেপ্রাণে সপরিবারে মরতে হতো।

বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালের একজন নার্স স্নেহলতা দেবী তাঁর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা জানান। ঘটনার বিবরণে তিনি বলেন, আমার নাম স্নেহলতা দে, আমি বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালের একজন নার্স। ১৯৪৯ সনে আগস্ট মাসে আমার স্বামীর অসুখের খবর পেয়ে তার কর্মস্থল মেদিনীপুর যাই। সেখানে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আমি পুনরায় বর্ধমান আসার জন্য মেদিনীপুর স্টেশনগামী একটি বাসে উঠে পড়ি। অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছিল। আমি একজন সৎসঙ্গী এবং শ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্যা। বাসে আরও ৩/৪ জন যাত্রী ছিল। মেদিনীপুর স্টেশনের কাছাকাছি তারা বাস থেকে নেমে যায়। আমিও ঠিক করি ওদের সঙ্গে নেমে গিয়ে

বাকী রাস্তাটা হেঁটে যাব। এই ভেবে যখন বাস থেকে নামতে যাচ্ছি তখন ঐ বাসের ড্রাইভার আমাকে বলল, আপনি এখানে নামবেন না, আমি আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব। এই বলে সে জোরে গাড়ি চালিয়ে স্টেশন পার হয়ে একটি নির্জন মাঠে গাড়ি থামিয়ে গাড়ির আলো নিভিয়ে দেয় এবং আমার কাছে এসে কুৎসিত অভিপ্রায়ে আমার হাত ধরে। আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে চিৎকার করতে থাকি। আশ্চর্যের বিষয় আমার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারপূর্ণ বিস্তৃত মাঠটি হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। এতে ড্রাইভার ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। আমি তখন একাকী ঐ জনশূন্য মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে একমনে ঠাকুরকে স্মরণ করতে থাকি। এই সময় ১৭/১৮ বছরের কনডাক্টরটি সেখানে এসে উপস্থিত হয়। আমার অবস্থা দেখে সে বললে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছি। ড্রাইভার মদ খেয়েছে, তাই ওর মাথার ঠিক নেই।

স্টেশনে পৌঁছে আমি G.R.P. Office-এ গিয়ে এ বিষয়ে সব জানালে তারা বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করে সেই ড্রাইভারকে তৎক্ষণাৎ ধরে আনে। আমি সনাক্ত করি। তখন হাজতে রাখা হয়। তারপর মেদিনীপুর কোর্টে ড্রাইভার দোষী সাব্যস্ত হলে তার ৫০ টাকা জরিমানা হয় এবং আসামীকে আমার পা ধরে মা বলে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ড্রাইভারটি পশ্চিম দেশীয়। তার নাম নরেন্দ্র সিং।

আমি চরম বিপদে পড়ে আকুল প্রাণে ঠাকুরকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া দিয়ে রক্ষা করবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। বুঝলাম ঠাকুরের উপর আমার অকুণ্ঠ নির্ভরতা ও অগাধ বিশ্বাসই ঠাকুরকে দূর থেকে আমার বিশ্বাসের কথা জানিয়ে দেয় এবং আমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমার বগাইল গ্রামের ডাক্তার সুধীরকুমার দত্ত ও তাঁর স্ত্রী ১৩৪৬ সনে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বছরই একটি ঘটনা ঘটে।

একদিন তাদের পাশের একটি বাড়িতে অকস্মাৎ আগুন লেগে যায়। এতে সুধীর-বাবুদের বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুধীরবাবু তখন তার বাইরের ঘরের ডাক্তারের ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করতে লাগলেন এবং স্ত্রীকে ভিতর ঘরের মূল্যবান জিনিসগুলি বার করার নির্দেশ দেন।

তাঁর স্ত্রী উত্তরে বলেন, ঘরে শ্রীঠাকুর রয়েছেন (ঠাকুরপট), এখন যদি ঘরের জিনিসপত্র বার করি তাহলে ঘরের সবটা পুড়ে যাবে। আর যদি ঘরে ঠাকুর থাকেন তবে আমাদের ঘরে আর কিছুতেই আগুন আসবে না। এই বলে তিনি ঠাকুরের

পটচিত্রটি কোলে নিয়ে কাতর ভাবে নাম জপ করতে থাকেন ঘরের দরজা বন্ধ করে।

এদিকে তখন ডিসপেনসারীর চালায় আগুন ধরে যাওয়ায় সুধীরবাবু চিৎকার করে তাঁর স্ত্রীকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলেন।

স্ত্রী তাঁর উত্তরে বলেন, শ্রীঠাকুরকে কোলে নিয়ে পুড়ে মরব, কিন্তু কিছুতেই বাইরে আসব না। এই বলে আকুল প্রাণে তিনি ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন।

আশ্চর্যের বিষয় ঠিক তখনই বিপরীত দিক থেকে প্রবল বাতাস এসে আগুনের গতি পরিবর্তন করে দিল এবং এতে সুধীরের ঘর আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ঠাকুরের এই সব বিচিত্রলীলা কাহিনীর মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায় সৎনামে দীক্ষিত ঠাকুরের প্রতিটি ভক্তকে ঠাকুর তাঁর মহান আত্মার এক একটি অংশ বলে মনে করতো। এই সব ভক্তদের যে কেউ যখন কোন স্থানে বিপদে পড়ে আকুল প্রাণে ডাকত, তখনই সে ডাক শ্রীঠাকুরের হৃদয়তন্ত্রে বীণার তারের মত অনুরণিত হয়ে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাঁর বিপদের কথা বুঝতে পেরে কখন সূক্ষ্মদেহে সেখানে গমন করে অথবা তিনি তার ঘরে অবস্থান করেই কেবল ইচ্ছার দ্বারা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন। ঠাকুরের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে হয়তো পরমপিতার ইচ্ছা যুক্ত হয়ে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতো।

কুষ্টিয়া নিবাস শ্রীশচন্দ্র নন্দী অনেকদিন ধরে হাঁপানি রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও রোগের কিছুমাত্র উপশম হয়নি। একদিন শ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় উকিল হরিশচন্দ্র রায়ের বাড়িতে শুভাগমন করেছেন। সেই সময় সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ও গোকুলবাবু ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হিসাবে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান উকিল হরিশচন্দ্র রায়ের বাড়িতে।

ঠাকুর তাঁদের দেখেই কপট রাগের সঙ্গে বলে উঠলেন, আপনার ও গোকুলবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলব না।

তখন সতীশবাবু বললেন, কিন্তু কেন?

শ্রীঠাকুর তখন বললেন, আপনারা থাকতে শ্রীশদা কতদিন ধরে এমন ভুগছেন আপনারা সারিয়ে দিতে পারছেন না।

সতীশবাবু বললেন, উনি তো আমাদের কিছু জানাননি তাঁর রোগ সম্বন্ধে। এ ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

ঠাকুর বললেন, জানাবেন আবার কি? আপনাদের কর্তব্য না জানালেও তাঁকে দেখে সারিয়ে দেওয়া। যাক সে কথা, এখনই ওঁকে সারিয়ে দিন।

তখন সতীশবাবু বললেন, তা কি হয়? এত শীঘ্র এতদিনের রোগ সারান সম্ভব

নয়। তাছাড়া আমার কাছে এ রোগের কোন ওষুধ এখন নেই। তাহলে বাড়ি থেকে আনতে হয়।

ঠাকুর বললেন, যা হোক একটা কিছু ওষুধ দিয়ে এখন ওঁকে সারিয়ে দিন। কুষ্টিয়ানিবাসী আর এক উকিল প্রফুল্লবাবু তখন ঠাকুরের অন্যান্য সব ভক্তদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করতেন এবং ঘটনাক্রমে সেই সময় তাঁর কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি বাক্স ছিল। ঠাকুরের পীড়াপীড়ি দেখে এবং এই পীড়াপীড়ির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পেরে তাঁর সেই বাক্সটি খুলে এক পুরাতন ও এ রোগের অনুপযুক্ত একটি ওষুধ বার করে এক মাত্রা নাম করতে করতে শ্রীশবাবুকে খেতে বললেন।

শ্রীশবাবু তখন নাম করতে করতে ঠাকুরের প্রতি ভক্তিভরে সেই ওষুধ খেয়ে ফেললেন।

কী আশ্চর্যের কথা, সেই একমাত্রা ওষুধ সেবন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশবাবুর এতদিনের দুরারোগ্য হাঁপানি রোগ একেবারে সেরে গেল।

এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন এ রোগ ওষুধের জোরে সারেনি। এখানে যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে তা নামমাত্র, হাঁপানি রোগের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। শ্রীশবাবুর এত দিনের রোগ এক মুহূর্তে সেরেছে শুধু কৃপাময় ঠাকুরের কৃপায় ও নামমাহাত্ম্যে। লীলাময় ঠাকুরের এও এক লীলা এবং এই লীলার মধ্য দিয়ে তিনি সৎ নামের মহিমা নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন ভক্তদের।

শ্রীঠাকুর প্রায়ই বলতেন, লোকের অমঙ্গল চোখের সামনে এলেই বারণ করি, যদি কথা শোনে, তাহলে ভাল হয়, কিন্তু না শুনলে জোর করতে পারি না—ভুল বুঝে সবাই অনর্থ ঘটায় দেখছি। কোন ভবিষ্যৎ দুর্দৈবের কথা কাউকে জোরের সঙ্গে বললেও তার পরীক্ষা করার বাতিক জেগে ওঠে, নয়ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একেবারে মুষড়ে পড়ে। তাই স্পষ্টভাবে কাউকে কিছু বলতে পারি না। আভাস ইঙ্গিতে লোকেদের ভাবী বিপদের কথা বোঝাতে চেষ্টা করি।

শ্রীঠাকুরের কথা অমান্য করে চললে কি ভীষণ দুর্দৈবের সম্মুখীন হতে হয় তা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত নিচের ঘটনাটিতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো ঃ—

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদার সংঘভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী ছিলেন শ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। তিনি একবার ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলকাতা থেকে দেশে ফিরবার সময়পথে ঠাকুরকে দর্শন করতে হিমাইতপুরে ঠাকুরের আশ্রমে

আসেন। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ঠাকুর প্রণাম করেই যতীন্দ্রনারায়ণবাবু বললেন, সেই রাত্রেই তিনি বাড়ি ফিরবেন। তাঁর সঙ্গী লোকজন, বিছানাপত্র সবই ঈশ্বরদী স্টেশনে রেখে এসেছেন।

ঠাকুর এই কথা শুনে বললেন, গুরুগৃহে এসে ধুলো পায়ে যেতে নেই, অন্ততঃ আজ রাত্রের মত এখানে থেকে যান। কাল সকালে না হয় আমার মোটরে আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।

যতীন্দ্রনারায়ণবাবু ঠাকুরের কোন কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে এবং জননীদেবী ও অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে ঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে এলেন। রাত তখন দশটা।

ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে রেখে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কেবলই বলতে লাগলেন, আজ রাতটুকু থেকে যান, আপনার কল্যাণ হবে। অন্ততঃ আমার এই কথাটা রাখুন।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথবাবু তখন বেপরোয়া। নিজ সঙ্কল্প সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে ভাড়াটে মোটরও যতীন্দ্রনারায়ণবাবুকে নিতে আশ্রমে পৌঁছেছে। আশ্রমবাসীরা প্রত্যেকেই তখন যতীন্দ্রনারায়ণবাবুকে এই বলে বোঝাতে লাগলেন যে, শ্রীঠাকুর যখন বলছেন তখন তাঁর রওনা না হওয়াই কর্তব্য। কিন্তু আশর্যের বিষয় যতীন্দ্রনারায়ণ কারোর কথাই শুনলেন না। এই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ বিলম্ব ঘটিয়ে যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ঠাকুর নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। যতীন্দ্রনারায়ণবাবু কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তন করলেন না। একান্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর যতীনবাবুকে বিদায় দিলেন।

যতীন্দ্রনারায়ণবাবু গাড়ীতে উঠতে যাবার সময় বলতে লাগলেন, আমার শুভকর্মে বাধা দিবেন না, আমি যাচ্ছি আমার বিষয় সম্পত্তি দেবোত্তর করে নিশ্চিন্ত হতে, কারণ কবে আছি কবে নাই। কারণ রাজা তাঁর সারাজীবনের সাধ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করে যেতে পারলেন না, শুভকার্যে বিলম্ব করা উচিত নয়।

ঠাকুর তখন তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বললেন, যতীনদা নিয়তি কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। সাবধানে যাবেন, যেন কোন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, তারপর যতক্ষণ যতীন্দ্রনারায়ণবাবুর মোটরখানি দৃষ্টির বাইরে না চলে গেল ততক্ষণ তিনি স্থিরভাবে সেই দিকে চেয়ে রইলেন তারপর কারোর সঙ্গে কোন কথা না বলে গম্ভীরভাবে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। সেদিন তিনি আর কারো সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না। তখন গভীর অন্ধকার রাত্রি। যতীন্দ্রনারায়ণের মোটর গাড়ি হু হু বেগে ছুটে চলেছে। সহসা একসময় ড্রাইভারের নিদ্রাজনিত অসাবধানতায়

মোটরটি একটি খেজুর গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাশের একটি নিম্নভূমিতে পড়ে গেল। যতীন্দ্রনারায়ণের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রইল। তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য সুধীর (কোকা) তীব্র আঘাতে হতচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইল। ড্রাইভারের সঙ্গের সহকর্মী সামনের কাঁচে ধাক্কা লেগে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারায়। সুধীরবাবু জ্ঞান ফিরে পেয়ে যতীন্দ্রনারায়ণের দেহ অতিকষ্টে খুঁজে বার করে দেখলেন তাঁর দেহে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

এমন সময় একটি যাত্রীবাহী বাস ঈশ্বরদী থেকে পাবনার দিকে যাচ্ছিল। সুধীরবাবু বাসটিকে থামিয়ে বাসের ড্রাইভারকে সব কথা জানিয়ে পাবনায় ঠাকুরের আশ্রমে খবর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। যতীন্দ্রনারায়ণবাবুর গাড়ির ড্রাইভার পলাতক।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের কথা জানান হলো। ঠাকুর তখন একটি মোটর ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে আহতদের পাবনার হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। যতীন্দ্রনারায়ণ ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহটি পাবনায় এনে সৎকার করা হয়।

যতীন্দ্রনারায়ণের ইষ্টানুসরণে নিষ্ঠা না থাকায় তিনি ইষ্টের নিষেধাজ্ঞা কাজের অজুহাতে অমান্য করেছিলেন তাই তাঁকে পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অকালে মৃত্যুর বলি হতে হয়।

১৪

পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার জন্য যুগে যুগে বহু সিদ্ধ সাধক অবতার-কল্প মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ছিলেন এমনই এক যুগাবতার ও জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ। যাঁর প্রবর্তিত সাধন পদ্ধতি ও ভাবাদর্শ ভারতের ধর্ম ও সমাজজীবনে কেবল মাত্র একটি যুগ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করেনি, যা ভবিষ্যতের সকল যুগে সকল মানুষকে সত্যের পথ দেখাবে।

বেদে আছে, ভগবান আদিতে একা ছিলেন। পরে স্বইচ্ছায় তিনি বহুতে বিভক্ত হয়েছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সহ অনন্ত সৃষ্টি তাঁরই এক একটি ভাবের প্রকাশ। এই অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে কারণ আছে সেই আদি কারণকে জানতে পারলেই সব কিছুকে জানা হবে। এই আদি কারণকে জানতে পারলেই সেই এককে জানা যাবে যা আদিতে এক হয়েও বহুর মধ্যে অজস্র রূপে বিরাজিত আছেন। সেই বহুর মধ্যে

দিয়ে একক জানা আবার একক জানার মধ্য দিয়ে বহুকে জানার জন্যই সাধকেরা চেষ্টা করেছেন। এবং এই জানার মধ্য দিয়েই পরম তত্ত্ব ও পরমার্থ লাভ করেছেন। যখনই কোন সাধক বহুর মধ্য দিয়ে একককে এবং একের মধ্য দিয়ে বহুকে জেনে আদি কারণের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন তখনই সেই সাধক পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং তিনি ব্রহ্মদর্শন করতে পেরেছেন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে যুগে যুগে বহু মনীষী ও মহাপুরুষ এলেও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান আছে এবং তিনি এমন একটি স্বতন্ত্র সাধন পদ্ধতি প্রবর্তিত করে গেছেন যা এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। এর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অন্যান্য সাধকদের মত ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ধর্ম সাধনার জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হননি! তিনি গৃহে থেকেই ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে এক অপূর্ব সাধন প্রক্রিয়া গড়ে তোলেন। সংসার জীবনের মধ্যে থেকে সংসার মায়ায় আসক্ত না হয়ে জৈব চেতনাগুলিকে একে একে অতিক্রম করে অতিমানস চেতনায় অধিষ্ঠিত হন তিনি। এইভাবে জীবন থেকে মহাজীবনে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে এবং তমসা থেকে এক জ্যোতির্ময়লোকে উত্তীর্ণ হন তিনি।

গীতায় আছে দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাকে হিন্দী ভাষায় সুরত বলে। এই সুরত মানুষের মনকে সঞ্জীবিত করে। মন ইন্দ্রিয়কে সঞ্জীবিত করে আর এর ফলেই স্থূলদেহের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সুরতই আমাদের দেহ জগতের প্রাণ, ইহাই জ্ঞান ও আনন্দের আকর। সাধনার দ্বারা মন ও সুরতকে আয়ত্ত করে বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়ে সেই সব স্থানের আনন্দ আস্বাদন করা যায়।

সৃষ্টির আদি কারণ নিজেকে অনাহত নাদ বা শব্দ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই আদি নাদ স্তর ভেদে কোথাও বরং কোথাও ওঁ কোথাও ক্লীং ও কোথাও বা হ্রীং রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। এই অনাহত নাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই শক্তি আছে। আকর্ষণের ফলে মানুষের মন অন্তর্মুখী ও বিকর্ষণ শক্তির ফলে মানুষের মন বহির্মুখী হয়ে পড়ে। সুরতকে নাদের অর্থাৎ শব্দের আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে একে ঊর্ধ্বগামী করে আদি স্থানে পৌছানোই সাধকের লক্ষ্য। তাই এই সাধন পদ্ধতির নাম সুরত শব্দ যোগ বা সুরত সাধন মার্গ। এই সাধন মার্গের তিনটি প্রধান অঙ্গ, যথা—সদগুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গ।

যার অস্তিত্ব বা প্রকাশ তাই সৎ। যেহেতু জগতের প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব আছে সেহেতু তাদের সৎ বলা যেতে পারে। কিন্তু জাগতিক পদার্থের অস্তিত্বসমূহ পরিবর্তনশীল

বলে তা সৎ হলেও পরিবর্তনীয় সৎ। একমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূলে যে আদি কারণ আছেন সেই আদি কারণের কোন পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী শাশ্বত—একমাত্র সেই আদি কারণকেই সৎ বলা যেতে পারে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র তাঁর সুরত সাধন মার্গের মধ্য দিয়ে সেই আদি কারণের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তার সাধন পদ্ধতিতে সৎ নাম সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরু—এই তিনটি 'সৎ'-এর উপর জোর দিয়েছিলেন।

সেই আদি কারণের সঙ্গকেই সৎ সঙ্গ বলা হয়। অর্থাৎ এই সৎ সঙ্গের মধ্যে দিয়ে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল আদি কারণের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সৎ নাম মানে সেই আদি কারণের নাম করা এবং মনপ্রাণ ও ধ্যানের মধ্যে সেই আদি কারণকে মূর্ত করে তোলা।

শাস্ত্রে বলে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভতি'—অর্থাৎ ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের মধ্য দিয়ে জানলেই হবে না, ব্রহ্মের মতো হতে হবে। এই ব্রহ্মের মতো হওয়াকে সাধকের ব্রহ্মভূত অবস্থা বলে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মভূত গুরুর সঙ্গ করাকে সৎসঙ্গ বলে। কারণ সদগুরুর মধ্যে আদি কারণ চৈতন্য রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। সদ্‌গুরুই সেই আদি কারণের সৎ, চিৎ ও আনন্দময় সত্তার মূর্ত ও জীবন্ত বিগ্রহ। সাধকের তাঁর চৈতন্যকে বিশেষরূপে প্রকাশ করতে হলে জীবন্ত সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাতে যুক্ত হতে হবে এবং সেই ভাবে পরিস্ফুরণ ঘটাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ছিলেন আদিকারণের সৎ, চিৎ ও আনন্দময় সত্তার জীবন্ত বিগ্রহ। তাই তিনি ছিলেন প্রকৃত সদ্‌গুরু। যাঁর পুণ্য পবিত্র সঙ্গ ও নাম প্রতিটি ভক্ত ও সাধকের আত্মাকে পূর্ণ চৈতন্যময় এক সুউচ্চ আধ্যাত্মিকতার স্তরে সমুন্নত করতে পারত। যার পূর্ণ সংস্পর্শে এসে জগতের ত্রিতাপ জ্বালাগ্রস্ত অসংখ্য মানুষের তাপিত প্রাণ শীতল হয় এবং যারা সংসারে থেকেও সংসারের মায়াপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

১৫

নদী বহু দিকদিগন্ত অতিক্রম করে বহু উষর ক্ষেত্রকে সজল ও শস্যশ্যামল করে যতই সাগরসঙ্গমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততই মন্দীভূত করে তোলে তার স্রোত ধারাকে। শ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিনটি যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই তাঁর বিচিত্র লীলাময়, কর্মময় মহাজীবনের বেগবান স্রোত ধারাটি মন্দীভূত হয়ে আসতে

থাকে ধীরে ধীরে। ঠাকুরের এই মহাপ্রয়াণটিকে এক রকম ইচ্ছামৃত্যু বলা যায়। কারণ তিনি তাঁর মহাপ্রয়াণের কালটিকে সকলের অজ্ঞাতসারে নিজেই বেছে নেন।

শ্রীঠাকুরের বয়স আশী বছরে পড়তেই ঠাকুর প্রায়ই ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁরে আমার আশী পুরতে আর কত দেরী আছে।

ঠাকুরের এই বয়স সম্বন্ধে সহজ সরল ঐ জিজ্ঞাসায় ভক্তদের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি কারণ এই জিজ্ঞাসার মধ্যে তাঁর মহাপ্রয়াণের ইচ্ছার কোন আভাস দেননি ঠাকুর।

অবশেষে শ্রীঠাকুরের বয়স আশী বছর পূরণ হতেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল ঠাকুরের কর্মজীবনে। তাঁর বহু বিচিত্র জীবনলীলার স্রোতটি ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগল। যে ঠাকুর লোকসমাগম দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠতেন সেই ঠাকুর আর লোকসমাগম সহ্য করতে পারেন না। নিজেকে কোন নিভৃত নিরালায় প্রচ্ছন্ন রাখতে ভালবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পরিবার পরিজন বা ভক্ত ও পার্ষদ-বৃন্দদের কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেননি ঠাকুর তাঁর পরমপিতার সঙ্গে মিলনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছেন মনে মনে। নিভৃত নিরালায় একা বসে বসে তিনি যেন সেই পরম মিলন সুখের পূর্বাস্বাদকেই উপভোগ করতেন একাগ্রচিত্তে।

অবশেষে যে দিনটি অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুরাগী ভক্তের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর অথচ অপরিহার্য সেই মহাপ্রয়াণের দিনটি এসে গেল। অথচ ঠাকুরের পক্ষে সে দিনটি কত আনন্দময়। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল তিনি যেন মুক্ত-পক্ষ এক বিহঙ্গমের মতো তাঁর দেহপিঞ্জর চিরকালের মতো ছেড়ে পাখা মেলে এক অনন্ত মহাকাশে অবাধে উড়ে যেতে চাইছেন।

মহাপ্রয়াণের দিন আসন্ন হয়ে এলেও তা বোঝার কোন উপায় ছিল না শ্রীঠাকুরকে দেখে। তার দেহে কোন রোগের লক্ষণ ছিল না। তিনি প্রতিদিন সকালে মোটরযোগে শহর থেকে দূরে ডিগরিয়া পাহাড়ের ধারে উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করতে যেতেন এবং যথাসময়ে ফিরে আসতেন। আহারাদিও পূর্বের মতোই করে যেতেন। জ্বলন্ত দীপ যেমন নিভে যাবার আগে সহসা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি ঠাকুরের জীবন-দীপ নির্বাপিত হবার আগে ঠাকুরের জীর্ণ দেহ স্বাস্থ্যের ছোঁয়া পেয়ে নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর পাণ্ডুর মুখখানা। সেদিনও তিনি হাসিমুখে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিকই ছিল এবং রক্তচাপের মধ্যেও কোন তারতম্য দেখা যায়নি। অথচ সেই দিনই অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী (বাংলার ১৩২৫ সাল-এর ১২ই মাঘ) শেষ রাত্রি ৪টা ৫৫ মিনিটে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর

অনুকূলচন্দ্রের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে উঠলেন তিনি।

পরদিন সকালে বড়দা ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের বার্তা ঘোষণা করে সৎসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভাই সব, বাবা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। না, না, তিনি আছেনই থাকবেনও! তিনি অজর, অমর, চিরভাস্বর। এস আমরা তাঁকে খুঁজে বার করি, অনুভব করি আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ধ্যান, জ্ঞান, পূজায়, আরাধনায়।

এই শোক সংবাদ ভোর হতেই লোকের মুখে মুখে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেওঘর শহর ও আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য শোকাকুল নরনারী পরম প্রেমময় ঠাকুরের মরদেহটিকে শেষ বারের মতো দর্শন করার জন্য ঠাকুর বাংলোর পার্লারে এসে ভিড় করতে লাগল। সকলেই তাদের পরম প্রিয়জন, রক্ষাকর্তা ও প্রাণের ঈশ্বরকে হারাবার বেদনায় মর্মান্তিক ভাবে আহত ও অধীর। সকলেরই চোখে মুখে গভীর শোকের ছাপ। সকলে এসে ভিড় ঠেলে ঠাকুরের মুখটিকে শেষ বারের মতো দর্শন করতে লাগল। দেখল প্রশান্ত গম্ভীর সে মুখে বিন্দুমাত্র কোন বিকার নেই। মৃত্যুর ভয়াল কালোছায়া গ্রাস করতে পারেনি সে মুখের দিব্য প্রশান্তিকে। সকলেরই মনে হলো তাদের পরম প্রেমময় ঠাকুর যেন শান্তভাবে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর শয্যাপার্শ্বে শোকাকুল অবস্থায় বসে আছেন ছোটমা, বড়দা, কাজলদা, বাদলদা, পিসিমা, ছোট বৌদি, রাঙ্গা বৌদি, বঙ্কিমদা প্রভৃতি। শ্রীশ্রীবড়মা পাশের ঘরে একটি শয্যায় শায়িত অবস্থায় স্তব্ধভাবে অঝোরে চোখের জল ফেলছেন।

মাঝে মাঝে বড়দা বসে থাকতে থাকতে ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শোকাহত জনতা কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। ছোড়দা কলকাতায় ছিলেন। খবর পেয়ে বেলা তিনটার সময় তিনি এসে পৌঁছলে আবার একবার কান্নার রোল ওঠে।

সূর্যাস্তের পর ঠাকুরের নশ্বর দেহটিকে এক বিশাল শোক মিছিলের মধ্য দিয়ে রোহিনী রোডের পশ্চিম দিকের ঠাকুরের নিজস্ব জমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য। সেই জমিতে একটি মঞ্চের উপর চন্দনকাঠ দিয়ে সাজান চিতার উপর শায়িত করা হলে বড়দা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী মুখাগ্নিকৃত্য করেন।

শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় রাত্রি দশটার পর। তারপর বিশেষ ভাবে আনা গঙ্গাজল দিয়ে চিতা প্রক্ষালন করা হয়। বড়দা, ছোড়দা, কাজলদা, শ্রীঠাকুরের পরিবারের সবাই এবং

সহস্র সহস্র সৎসঙ্গী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

ঠাকুরের মর্ত্য লীলার অবসানে তাঁর মরদেহটি ভস্মীভূত হয়ে গেলেও তাঁর অমর আত্মার তো মৃত্যু নেই। ঠাকুরের মত ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মভূত জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষদের আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। সে আত্মা মহাপ্রয়াণের পর সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে ব্রহ্মালোকে চিরকাল অবস্থান করে।

বড়দা তার শোকবার্তায় ঠিকই বলেছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেনই, তিনি অজর, অমর, চিরভাস্বর। শুধু ধ্যান, জ্ঞান ও আরাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে তাঁকে খুঁজতে হবে। তিনি আমাদের সকলের অন্তরাত্মার মধ্যে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। শুধু আকুল প্রাণে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকলেই আমরা পাব। তাহলে তিনি আগের মতই সব বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

বড়দার এই বাণী এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত। এ বাণী নিঃসন্দেহে শ্রীঠাকুরের অগণিত ভক্তের শোকতপ্ত হৃদয়কে শান্ত শীতল করবে।

কথামৃত

১. প্রতি মানবের থাকবে একজন জীবন্ত আদর্শ। তার অকাট্য টনের সম্বেগে প্রত্যেককে সংসারে চলতে হবে। মানুষের জীবনের যত কিছু বৃত্তি এই আদর্শকে সার্থক করবার জন্য নিয়োজিত করতে হবে। স্বাস্থ্যই বল, শিক্ষাই বল, শিল্পই বল, বাণিজ্যই বল, বিজ্ঞানই বল, আর স্বাধীনতাই বল প্রত্যেককে সবকিছু অর্জন করতে হবে এই আদর্শকে সার্থক করার জন্য।

২. সেই দেহ পূর্ণ যে দেহ পূর্ণ মন গঠনের উপযোগী সেই মন পূর্ণ যেমন পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা লাভের উপযোগী সেই আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ যাহার অধিক কেহ জ্ঞাত নয়। অন্ন-বস্ত্র-বাসগৃহ দেহের জন্য, মনের জন্য চাই সৎ চিন্তা আর আত্মার জন্য সাধনা। আত্মার গৃহ মানসদেহ আর মানসদেহের গৃহ স্থূল দেহ।

৩. কর্মেন্দ্রিয় শরীরের সেবক। শরীরের সেব্য মন। মনের সেব্য আত্মা। আত্মা (ধর্ম) যেখানে অসেবিত মন সেখানে দুর্বল আর শারীরিক অভাববোধ প্রবল।

৪. আলো আসে,—
আর যখনই সে আসে
আসে তমসার বক্ষ বিদীর্ণ করে,
আর সেই তমসাই অবিদ্যা অজ্ঞান।
বিশৃঙ্খলা ছিটিয়ে থাকে ইতস্ততঃ
আর তা হতেই ফুটে ওঠে
শৃঙ্খলা—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
অন্তর্নিহিত আবেগ ব্যঞ্জনায়,
পাশাপাশি
পরস্পর সমসাম্যে।
আশীষ বীজাণু প্রাণনে
উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে
জীবনে—
যা গেছে তারই ফাটলে,—
ফুটে ওঠে আরোতে

সম্বর্ধনায়।
সেই তিনি এক, অদ্বিতীয়,
সচ্চিদানন্দ
একই সার্থকতায় সম্বর্ধনী সত্তায়
একই হয়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে
দান ভরিয়ে দেন প্রতিটিকে
স্বতন্ত্র সংস্কার বৈশিষ্ট্যে।
ব্রতী ভক্ত তাতেই যুক্ত হয়ে
সক্রিয় অনুসরণে
উপাসনায় সার্থক হয়ে ওঠেন—
আর তিনিই মূর্ত্ত আশীষ,
ভাগবত-মানুষ,
আদর্শ,
কলুষ ত্রাতা—
যুগে যুগে নানা ভাবে
যথোপযুক্ততায়—
একই তাৎপর্য্যেরই নানা আবির্ভাব।

৫. সংসক্তেরা দলে দলে ছোটে,
পারস্পরিক সেবা সন্ধিৎসু সহানুভূতি নিয়ে
তাঁকে সেবা করে সার্থক হতে
তাতে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে সমাজ
বৈশিষ্ট্য সার্থকতা নিয়ে
সেই সমাজেরই বুকে
গুচ্ছ বেঁধে ওঠে
সংঘ বা সম্প্রদায়
প্রতি প্রত্যেকটি গুচ্ছ প্রত্যেকটি গুচ্ছের স্বার্থ হয়ে
মূল অনুরাগ উদ্দীপনে।

৬. সংহতি আবর্তিত হ্যতে হতে চলে,
শক্তি গর্জমান হয়ে ওঠে,
সেবা সহানুভূতি নিয়ে ফুটন্ত হয়ে ওঠে,
বিবেক সজাগ হয়ে রয়,
ঐশ্বর্য স্বতঃ উন্মাদনায়
গজিয়ে উঠতে থাকে
এমনতর দ্রাবক নিয়ে
যা—
সব কিছুকে গলিয়ে
সার্থক করে তোলে যা কিছু বাদকে
সার্থক সাম্যে,
মুক্তি তখনই সেখানে উঁকি মারে—
তার আশীষ হস্ত বিস্তার করে
সব প্রাণকে মুক্তি দিতে—
বিধ্বংসী বাঁধন থেকে—
যা সত্তা ও সম্বর্ধনাকে ভেঙ্গে ফেলে
আর সৃষ্টি করে অমৃত আসন
যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে
ধর্ম—
যা কিছু থাকে যার উপর—
যা সবাইকে ধারণ করে
অতুলনীয় সব বিভিন্ন এককে
একত্বে সংযোজিত করে।

৭. জাগ্রত হও
আন্দোলিত হয়ে ওঠে।
চলতে থাকে উচ্চ আবর্তনে
আর চলন্ত করে তোল অন্যকেও
সমবেত হও,
সংযুক্ত হও, —
আদর্শকে,

সেই ভাগবত মানুষকে
সেবায় পরিপালন কর।
নিজে পরিসেবিত হও,
আর তোমার যা কিছু তাকেও কর,
তারই ভিতর দিয়ে—
পরিপোষণে, পরিপূরণে
সংহতি জৌলুস নিয়ে
সর্বতোভাবে
স্বর্গপথে।

৮. মানবের মুক্তির সাধনায় নারীই একমাত্র সহধর্মিণী—অমৃতের সহযাত্রী।

প্রয়োজন হলে তোমার শত মনোবৃত্তি অনুসারিণী পত্নী হউক, তাঁহারা তোমাকে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাকার্যে সর্ব প্রযত্নে সাহায্য করবে। তোমার শত শত আদর্শ প্রাণ চরিত্রবান সুপুত্র হোক, তাহারা দিকে দিকে তোমার ইষ্টের জয়গান ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে পারিপার্শ্বিকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করবে, তোমার প্রচুর অর্থ হউক—দুনিয়ার সবাইকে ইষ্ট স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইষ্টের প্রীতিকামনায় লোকহিতৈষণাব্রতে সে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইবে।

৯. ইষ্ট নিষ্ঠ থাক
অটুটভাবে,
ধৃতি আচরণ
বিহিতভাবে করে চল,
ভগবানের সংসার ভর দুনিয়াই,
তুমি বিস্তার লাভ কর তাতেই—
ভজন চর্য্যা নিয়ে।
(নিষ্ঠা-বিধায়ণা ।৬।)

১০. ভক্ত হতে গিয়ে
স্বার্থপর চালবাজ ভক্তি হতে যেও না,
ওটা কিন্তু তোমার জীবনে
একটা কুৎসিত কলঙ্ক বিশেষ;
ভক্তই যদি হতে চাও—
উর্জ্জী অনুচলনে

উপচীয় ইষ্টকর্ম্মা হয়ে ওঠ—
ভজন পরিচর্যায়,
আর,নিজেকে আমূল বিন্যাস কর
তাঁরই আদর্শে...(নিষ্ঠা-বিধায়না....) ৭৪।)

১১. সেই কাজ করবে যে কাজ Do to others as you like to be done by others; (তুমি অপরের জন্য সেই কাজ করবে যে কাজ অপরের কাছ থেকে তুমি পেতে চাও)

১২. কামিনী কর্মেরই কেন্দ্র, মানুষ যেখানে মূর হয়ে ওঠে। উন্নতিতে সার্থক হওয়ার বৃদ্ধি পাওয়ার আকুতি লাঞ্ছিত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, অজ্ঞানতায় তার জগৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠে। অবশেষে মৃত্যুতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হয়ে যায়। গীতায় আছে,

সঙ্গাৎসজ্ঞায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিসমঃ
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

অর্থাৎ যে বুদ্ধি স্ত্রীতে কামলোলুপ করে তোলে তা হতে দূরে থাক।

যে অর্থ ভ্রান্ত স্বার্থ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিককে বঞ্চিত করে নিজেকে সেবামূঢ় অথচ প্রতিপত্তিপ্রয়াসী করে তোলে সেই অর্থ হতে দূরে থেকো।

মেয়ে আমার,

তোমার বলা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা, পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে, নতজানু হয়ে, সসম্ভ্রমে, ভক্তিগদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী, আমার! বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী।

১৩. পৃথিবীর পূর্বতন অবতার, প্রেরিত ও মহাপুরুষদিগকে আপ্ত বলে স্বীকার করা এবং তাদের সম্ভ্রমের সহিত তাহাদের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকা উচিত।

যিনি পূর্বতনে সশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরই বাণী ও কর্মের তাৎপর্য নিরূপণে এবং তাঁরই আরোতর প্রগতিতে সম্বেগোদীপ্ত সার্থকতায় বাস্তবে পরিণতিতে চলিয়াছেন তাহাকেই সেইযুগ বা সময়োপযোগী প্রেরিত বা গুরু বলে স্বীকার করে ও তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে; পূর্বতনদের তাঁতে প্রত্যক্ষ করে নিবিষ্ট মনে চলতে চেষ্টা করা উচিত।

যেকোন সম্প্রদায়, যেকোন মত বা গুরু ও কুলগুরু উপদিষ্ট সাধনায় কেউ নিবিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, তা ত্যাগ করে হোক বা না করেই হোক, সৎ মন্ত্রে প্রত্যেকেরই দীক্ষিত হয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

১৪. যাকে মানুষ ভালবাসে, তার কষ্ট হয় যাতে, খ্যাতির অপলাপ হয় যাতে, অবসন্ন হয় যাতে, বেদনা পায় যাতে—তা কি সে কখনো করতে পারে? কারণ তার সর্বপ্রকার তুষ্টি ও পুষ্টিই যে তার স্বার্থ, তার নিজের সুখের জন্য সে যাকে ভালবাসে বলে মনে করে তার বেদনার কারণ হয়, তার খ্যাতি তুষ্টি পুষ্টি ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে অনুযোগ সহকারে আপন সুখ লালসার পরিতৃপ্তি সাধনে ভাব ভালবাসার মানুষকে বাধ্য ও বদ্ধ করতে চায়, নিশ্চয়ই সে কাহাকেও ভালবাসে না, সে ভালবাসে তার কল্পনাপ্রসূত ভোগলালসাকে—তাই, মানুষকে বেদনা দিতে বা বিব্রত করতে তার মোটেই কুণ্ঠা বোধ হয় না।

এমনতর মানুষ হতে মানুষের সাবধান হওয়া উচিত।

১৫. কৃত্রিম বা স্বার্থান্ধ ভালবাসা প্রিয়র প্রিয়কে কিছুতেই প্রিয় ভাবতে পারে না, সে সর্বপ্রকারে তা হতে দূরে থাকতে চায়, ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে, ভালবাসা প্রকৃত না হলে বুদ্ধি করে চললেও প্রায়ই ফাঁস হয়ে পড়ে।

ভালবাসা এলে ভাবের বৃদ্ধি হয়, মানুষ তদ্‌ভাবাপন্ন হয়, আর তদ্‌ভাবাপন্ন হলেই বোধ বা বুদ্ধি জাগ্রত হয়। তাই সত্যিকারের ভালবাসা যদি হয় তবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় না যাকে সে ভালবাসে তার কি প্রয়োজন, তার কিসে খ্যাতি, কিসে বা অখ্যাতি, কিসে বা সুখ, কিসে বা দুঃখ, কি করলে তার ভাল হয় আর কি করলেই বা তার মন্দ হয় আপনিই এ সব তার মনে ভেসে ওঠে। তাই তার চলনও বেফাঁস হয় না।

১৬. ভালবাসা মানুষকে বদ্ধ করে না কোণঠাসা করে বা একঘরে করে তোলে না। বরং উদার করে, মুক্ত করে, সেবাপরায়ণ করে তোলে, আটক রেখে শুধু ভোগের খেলনা করবার কথা ভাবতেও পারে না। ভালবাসা তার মানুষকে ভুলতে পারে না, ত্যাগ করতে জানে না, মৃত্যুকে আড়াল করে অমৃতের পথে নিয়ে চলে। তাই তার অনুসরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেয় না, ভয়, দুর্বলতা, বিরক্তি ইত্যাদিকে দূর করে তাড়িয়ে দেয়। নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ তার উত্তর সাধকের মত মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে।

১৭. মানুষ বিশ্বাসের যত গভীরতর দেশ স্পর্শ করে সে তত শক্তিশালী হয়। আর তার ভাব ও ভাষাও তেমনি শক্তিশালিনী হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা প্রত্যেক হৃদয়কে গভীরভাবে আঘাত করে, আর তখন প্রত্যেক হৃদয় পাগল হয়ে তার প্রতিধ্বনি করে। তা না হলে সিদ্ধ না হলে বিশ্বাস মজ্জাগত না হলে মনের কল্পনা মনে উঠেই লয় হয়, জগতে তার সাড়া পাওয়া যায় না আর তাতে কাজও খুব কম হয়। গুরুগোবিন্দের কথা তো জানেন, কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বিশ্বাসকে মজ্জাগত করার কী

গভীর সাধনাই না করেছিলেন। তাই অমনতর জাতি সৃষ্টি হয়েছিল—কত ঝড় বাতাস বিপত্তিতে একটুও কাঁপেনি।

১৮. নাম সাধতে গেলে প্রথম প্রথম হৃদয়ের আবর্জনাগুলি ভেসে ওঠে সংশয়, দুর্বলতা, অবিশ্বাস, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। কিন্তু তাতে নজর দিতে নাই, তাতে যুক্ত হতে নেই, কারণ সেগুলি মলিনতা—যা মনকে মেঘমলিন অন্ধকারময় করে রেখেছিল, ওর সাথে যুক্ত হলে মন আবার মলিন হয়ে ওঠে।

তারপর সূর্য প্রকাশের পূর্বে যেমন মেঘগুলি টুকরো টুকরো হয়ে কেটে যায় সূর্যও প্রকাশ পায়, আকাশও মেঘমুক্ত হয় এও তেমনভাবে নাম করতে করতে কু মেঘগুলি টুকরো টুকরো হয়ে কেটে যায়, অমনি ধীরে ধীরে জ্যোতিঃও প্রকাশ পায়, মনও শান্ত হয়, মনাকাশে ধীরে ধীরে নাদেরও উদ্বোধন হয়—আর আস্তে আস্তে সমস্ত তত্ত্বগুলিই প্রকট হয়। চাই গভীর বিশ্বাসের সাথে সাধনা।

১৯. মানুষ তো দুবর্লই, মন তো কলঙ্কে ভরাই। তাই বলে তাঁর নাম করতে তাঁর সঙ্গে প্রণয় করতে কেন বিমুখ হবে? তুমি কেন দুর্বল বলে কলঙ্কিত বলে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটবে না? হও তুমি ছোট, তাতে ক্ষতি কি? তুমি অন্ধকারময় হলেও তাঁর স্পর্শে আলোকিত হয়ে পড়বে, কারণ তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তুমি দুর্বল তাতে কি হলো? আলিঙ্গনকর পরম পিতাকে, নির্ভয় হও। তাঁকে স্পর্শ কর, তুমি পরম শক্তিমান হবে। ভাবনা কি? তিনি শক্তিস্বরূপ।

২০. ওরে লেগে যা, তোরা লেগে যা, আর একবার ভীমবেগে লেগে যা, দীনভাবে গর্বের সাথে স্মরণ কর, আমরা তোমার সন্তান। আমরা তোমারই। আর প্রত্যেকে তাঁরই স্মরণ করে আলিঙ্গন কর, কোল দে, সকল দ্বন্দ্ব ব্যথা ভুলে গিয়ে সবার পায়ে লুঠে পড়। ওরে আবার মুছে দিক তোর কোঁচার কাপড়। যেখানে ব্যথা, যেখানে আছে ব্যথাভরা অশ্রুজল, অভিসম্পাতের দারুণ আঘাত, অনুতাপের তীব্র চাবুক, অশান্তি আর অপঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা।

২১. আমাদের তো এলিয়ে পড়বার সময় নয়। অবসাদে গা ঢেলে দিয়ে রোদন করবার সময় নয়। এখন তীব্র সাধনার তীব্র কর্মের দিন এসেছে। সমস্ত ক্লীবত্বকে তাড়িয়ে দিয়ে লেগে যেতে হবে। ঝাঁপ দিতে হবে প্রবল মহান কর্মসাগরে, দুর্দশার ভয়ে এলিয়ে পড়লে চলবে না। এখনও যদি ভাববার অবসর খুঁজি, এখনও যদি হিসাব নিকাশ করি লক্ষ্যেতে পৌঁছাবার বিরুদ্ধে তবে কি আর নিস্তার আছে।

২২. ওঠো জাগো, আর সময় নেই, আর কারু অপেক্ষা করো না, যাও যেখানে যেখানে দ্বন্দ্ব, যাও যেখানে যেখানে তোমাকে তোমার উদ্দেশ্যকে তোমার লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে, নিন্দা করে, ঘৃণা করে, আর সেখানে তোমার কথা, তোমার ব্যবহার,

তোমার আদবকায়দা, সর্বোপরি তোমার বিশ্বাস আর তার প্রাণশক্তি সব বিরুদ্ধতাকে জন্মের মত অবনত করে তোমার বিশ্বাসের চরণতলে এনে তাকেও তোমার মত উদ্যত, নিরভিমান, নিরলস ও নিঃশঙ্ক করে তুলুক।

২৩. ওরে আহাম্মক, ওরে সোহাগ শিথিল মত্ত খেয়ালী, ওরে আদরে দুর্বল, অপারগ দাম্ভিক, দাঁড়ারে দাঁড়া। এখনও ফিরে দাঁড়া। যদি লালকণিকা এখনও তোদের ধমনী ত্যাগ করে না থাকে, ফিরে দাঁড়া, ঝেড়ে দাঁড়া। বল, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বল, ঠাকুর! আমি তোমারই, আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে সার্থক হোক, আমার বৃদ্ধি তোমায় স্পর্শ করুক। আর তোমার ইচ্ছা আমার জন্ম ও জীবনকে ধন্য করে তুলুক।

২৪. দুঃখ দেখে দুঃখ করিস না মেয়ে, তাঁর দেওয়া ব্যথা যে বড় মিষ্টি, তার আঘাত যে বড় কোমল, কারণ তাতে যে তাঁর স্পর্শ আছে। তাঁর অনাদর, তাঁর অবহেলা মনটাকে যে তাঁর চিন্তায় অবশ করে ফেলে। তা কি চাসনে মা? ব্যথার সুখ যে তাঁর দেওয়া ব্যথারই আছে। তাঁর বিরহ কি তার জন্যই মন প্রাণ পাগল করে তোলে না?

২৫. দ্যাখ মা, জন্মিলেই তার কালের বেত্রাঘাত সইতে হবেই, আর যতই মা আমরা বেতের দিকে নজর রাখব ততই জর্জরিত হব। কিন্তু সেই মা চতুর, সেই মা ভাগ্যবান যার মন পরমপিতায় মুগ্ধ, কারণ কশাঘাত তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই আঘাতের ব্যথাও অনুভব করতে পারে না।

২৬. যখনই মানুষ দুঃখের কশাঘাতে অস্থির হয়ে ওঠে, বেদনায় তাঁর কোমল ফুরফুরে হৃদয়খানা ছেয়ে ফেলে, তখনই সে আকুল নয়নে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকায় আর তার দরদীকে খোঁজ করে, কিন্তু সুখের সময় তা হয় না। যেন সে তখন অবশ, ব্যথা নেই, দরদীর খোঁজ নেই। তাই মেয়ে ব্যথা যে বসন্তের কোকিলের মত; দরদীর আগমনের পূর্বে ব্যথাই আসে, কেবল বলে, দরদী এলো এলো। সেই প্রতীক্ষায় বুক বেঁধে শত শত অপমান অবসাদ সহ্য করতে পারবি না? তাই বলি সুখেই থাকিস আর দুঃখেই থাকিস, কিছুতেই তাঁকে ভুলিস না। আর চোখ দুটো গলে গেলেও সে ছাড়া অন্য দিকে তাকাস না, তাতে তুই মরিসই বাঁচিসই। কি বলিস।

২৭. ধীর হতে হবে আমাদের, সাহসী হতে হবে আমাদের। আর আমাদের সাহসী বা ধীর হওয়া মানে মানুষ খুন করা নয়, বরং মৃত্যুকে অবনত করে মানুষকে জীবনে আনয়ন করা, যাতে মানুষ মঙ্গলের অধিকারী হয়। যাতে মানুষ উন্নত হতে পারে। যাতে মানুষ বিধ্বস্তি ও বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। নিঃস্বার্থভাবে, অবলান সাহসে, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আমাদের তাই করতে হবে। বীরের স্বভাবই মানুষকে মুক্ত করা, উন্নত করা প্রশস্ত করা।

২৮. চাইতে হলেই করতে হবে, আর না করলে পাওয়া হবে না। কিছু করতে গেলেই পেতে হবে দুঃখ, ব্যথা, অবসাদ। যখন তা সহ্য করেও যত অক্লান্ত মনে অম্লান বদনে তা করতে পারব আর কষ্টটা যত বেশী হবে আমাদের পাওয়াটা ততই সুন্দর হবে।

২৯. শুধু ভাবপ্রবণ হয়ো না। ভাব ও বোধগুলিকে করা ও বলার ভিতর দিয়ে জীবনবৃদ্ধির অনুকূল করে বাস্তবে পরিণত করো।

৩০. ক্রোধকে পাপ বলে জানবি। ওকে প্রশ্রয় দিবি না, সহ্য করবি। সহ্য করার চেয়ে আর বড় গুণ নেই। দ্যাখ সংসারে থাকতে হলে মাঝে মাঝে ফোঁস করার দরকার।

৩১. সুখে দুঃখে যার সমান ভাব, সুখেও ডুবে পড়ে না, দুঃখেও কাতর হয় না তারাই সচ্চিদানন্দ।

৩২. মন সরল, মধুর বচন, আর বুক ভরা প্রেম তিনটিই মুক্তির প্রধান উপায়।

৩৩. দেখ 'পারিনে' খবরদার বলবিনে, চেষ্টা কর। কর্ম ছাড়া ভগবানও কিছু নয়, ভগবান ছাড়া কর্মও কিছু নয়। বুকের তেজ না থাকলে কি আর বিশ্বাস হয় রে? বিশ্বাস বীরভোগ্যা। শক্তিহীনের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না।

৩৪. দেখ মন যদি কখনও কোথায় কু হয়, তবে মানুষের কাছে বলবি। আর তোর যে শত্রু তার কাছে আগে বলবি, তার সঙ্গে আগে মিত্রতা করবি। যে তোকে লাথি মারবে, তাকে বল ভাই।

৩৫. সংসার সংসার করে যত জড়িয়ে ধরবি সংসার তত তোকে ফাঁকি দেবেই দেবে। বিচারের আর কিছুই নাই। কেবল অন্তরে অন্তরে বিচার করবি, কোথায় তার দোষ।

৩৬. যে স্ত্রী স্বামীকে ভগবানের দিকে যেতে দেয় না সে জানবি অসতী, তার সংস্পর্শে স্বামী সমেত মারা যায়। সতের দিকে যে যেতে না দেয় সেই অসতী। ভগবানই সৎবস্তু।

৩৭. না না, পরের কাছে কারও নিন্দা করিস না। যদি নিন্দা করতে হয় তার সম্মুখে কর। ভালবেসে যা করবি তাই ভাল। আত্মপ্রশংসা সব ছেড়ে দে। প্রাণ খুলে পরের প্রশংসা কর।

৩৮. সব জাতি মিলে একসঙ্গে বসে খেলে কি সর্বধর্ম সমন্বয় হয় রে? সব্বাইকে জানতে হয়, সব ভগবান এক, সব্বার প্রাণ এক হওয়া চাই। প্রাণে প্রাণে জানা চাই ঈশ্বরকে।

৩৯. সব সময় ভাববি আমি যন্ত্র ভগবান যন্ত্রী তা হলেই পাপ স্পর্শ করতে পারবে

না। কামকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।

৪০. কমেন্ট না করে কমেন্ট পেয়ে সন্তুষ্ট হতে চেষ্টা করা ভাল। তাহলে কোনদিন কারোর সাথে ঝগড়া হয় না।

৪১. যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে কিন্তু জগৎকে ভালবাসে না, সে ভালবাসা কখনও ভালবাসা নয়। সে কেবল মত্ততা।

৪২. মেয়েদের দেখা চাই মায়ের মত। বাজারে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকেও, ঘরে যে আছে তাকেও।

৪৩. মেয়েদের যতদিন খাঁটি মা ভাবতে না পারছিস ততদিন তাদের মুখের দিকেও চাইতে পারবি না। পথ সত্যের ও মখমল দিয়ে ঢাকা, দুদিকে দুটি মস্ত খাদ, একটা কামিনী একটা কাঞ্চন। একটু হেলিস দুলিস যদি তবে খাদে পড়ে মারা যাবি। যদি আর কোন দিকে না চেয়ে সেই ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে অর্থাৎ পরম পিতার দিকে চেয়ে চলে যেতে পারিস, তবে আর কোথাও পড়বি না।

৪৪. মনে করবি প্রত্যেকের ভিতর ভগবান আছেন। জগতে যা কিছু সব তাঁর জিনিস বলে ভালবাসবি।

৪৫. দ্যাখ ভালবাসার বড় শক্তি, এটি নরককেও স্বর্গ করে দিতে পারে। ভগবানকে ভালবাসি কিনা ঠিক করতে হলে, আগে দেখতে হয় আমি জগৎকে ভালবাসি কিনা। যদি দেখিস জগতের প্রত্যেক জীবকে ভালবাসি, প্রত্যেক বস্তুকে ভালবাসি, তখন বুঝবি আমি ভগবানকে ভালবাসি।

৪৬. ভগবানই সৎবস্তু। নাম আর ভগবানে পৃথক নাই। নামকেই জানবি ভগবান বলে।

৪৭. দ্যাখ, ভগবানকে আনতে হলে বিশ্বাস দিয়ে সিংহাসন তৈয়ার করতে হয়। দ্যাখ্ সেই অমল-ধবল বিশ্বাস ব্যতীত সেই পরমাত্মার আগমন হয় না, ভগবানের আসন হয় না।

৪৮. কর্ম না করলে ধ্যান হয় না। আসল ধ্যানে অধিকারী হয় না। যে যত কর্মী সে তত ধ্যানী। ঘুম বেশী করতে নেই। ঘুম বেশীতে লয় এনে দেয়। মাঝামাঝি থাকবি।

৪৯. এই মনটা যদি শাশ্বতপদে ফেলে দেওয়া যায় তবে আপনি আনন্দে উথলে উঠে আর যদি নরকের দিকে ফেলে দেওয়া যায় তবে আপনি দুঃখ উথলে ওঠে। সবই মন।

৫০. মনের শক্তি যেখানে বল সেখানে চাই মন, মন হলে প্রাণ, প্রাণ হলে আমি।

৫১. দ্যাখ রেলগুলো সোজা জটিল নয়, তাই দৌড়ে নিয়ে যায়, তেমনি মনটা কোন

রকমে সরল করতে পারলেই প্রাণ ইঞ্জিন গেল আর কি একদম দার্জিলিং।

৫২. ভক্তের পথ দিয়ে হেঁটে চল। চোখ দুটি রাখ জ্ঞানের উপর।

৫৩. ভক্তি না হলে জ্ঞান পাওয়া যায় না। শুদ্ধ নিরেট ভক্তিই চরম জ্ঞান। সে ভক্তির ফল আমি। এই মুক্তি, এই নির্বাণ।

৫৪. সংসারী সন্ন্যাসী চাই, জঙ্গলের সন্ন্যাসী আর চাই না, নিতাই চাই।

৫৫. থাকবি সংসারে মন রাখবি ভগবানে।

৫৬. যদি বিশ্বাস করিস, কানাকড়িও মূল্য আছে, আর যদি বিশ্বাস না করিস তবে মোহরের মূল্য নেই।

৫৭. জগতে বিরাট থেকে ক্ষুদ্রকণা পর্যন্ত সবই সেই এক ভগবানের সত্তা। কেউ কাউকে হিংসা করিস না। বন্ধুকে একটু কম ভালবাসিস ততে ক্ষতি নেই, কিন্তু শত্রুকে খুব বেশী। সমুদ্রের জল থেকে লবণ বার করলে জলও খাদ্য লবণও খাদ্য।

৫৮. সন্ধ্যায় শব্দ শোনা যায়। সন্ধ্যায় দিয়ায় রাত আসে, ভোরেও। তাই এই দুই সময়ই কাজের প্রকৃত সময়। দুই সময়ই ভাল।

৫৯. দ্যাখ তেমন করে নাম করতে পারলেই আয়ু বৃদ্ধি হয়। নামের সঙ্গে সঙ্গে আয়ু বল সব বেড়ে পেড়ে। নামে মুক্তি। অনবরত নাম করবি আর চলতে ফিরতে সব সময় নাসামূলে দৃষ্টি রাখবি। দ্যাখ যে আপন গুরুকে ঐ জায়গায় জাগিয়ে নিতে পারে, তার সব হবে।

৬০. ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রাহ্মণ হলেই ভগবানও বুকে পা রাখে। ব্রাহ্মণের পা ভগবানও আরাধনা করে, তাই কৃষ্ণ ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বুকে ধরেছিলেন।

৬১. কু-ব্যাধি সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধী আচার নিয়মকে প্রতিপালন করে শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ করে তুলবে।

৬২. শরীর ও সময়ের উপযুক্ততা হিসাবে মাঝে মাঝে নামমাত্র আহার বা বিধিপূর্বক উপবাস শ্রেয়।

৬৩. অনিয়ন্ত্রিত ভাবে যাতে কিনা শরীর ও মনের অবসাদ আসে এমনতর ভাবে স্ত্রী সহবাস না করা, অন্ততপক্ষে স্ত্রী কর্তৃক অনুরুদ্ধ বা প্রার্থিত না হয়ে যৌন ব্যাপারে রত না হওয়াই উচিত।